[illegible]



শ্রীতারাকান্ত কাব্যতীর্থ

সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৮।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩৩৩ সাল।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

Printed by
PANCHANON BAGCHI.
at the
India Directory Press.
38/1, Musjidbaree Street, Calcutta.

উৎসর্গ।

অধুনা যিনি ভারত-গভর্ণমেণ্টের আইন-সচিবের সর্ব্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত,—যিনি বিদ্বান্, বিদ্বজ্জনপ্রিয় ও সাহিত্যের-সরসিক,—সেই অশেষশ্রদ্ধাস্পদ, নিখিলকল্যাণ-নিলয়—

শ্রীমান্ সতীশরঞ্জন দাশ—

মহোদয়-করকমলেষু—

মহাপ্রাণ! জানি না, কি গুণে আপনি আমায় ভালবাসেন। কাব্যগতিকে আপনার সহিত প্রথমালাপ অবধি আপনি আমায় স্নেহ-শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। যখন সান্ধ্য অবকাশে নানা সরস কথার আলাপ-আলোচনা চলিত, তখন প্রধানতঃ আমাকেই আপনি তাহাতে যোগদানে সাদরে আহ্বান করিতেন। আমি কথা-প্রসঙ্গে সে সময়ে যে দুই একটী রসভাবময় প্রবন্ধ-প্রবচন, সংস্কৃত শ্লোক বা গল্প-উপন্যাস বলিয়াছিলাম, নিসর্গসহৃদয় পুরুষ আপনি, তাহাতেই আপনার হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল। আপনার সেই রসজ্ঞতার ফলেই আমার 'গুপ্ত-উপন্যাস' ব্যক্ত হইয়াছে, আর আজ এই 'রসাল'ও ফলে, ফুলে, পল্লবে পরিশোভিত হইয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত হইল। সুতরাং ইহাও আপনারই করকমলে অর্পণ করিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

আলঙ্কারিকেরা বলেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'।—রসাত্মক বাক্য মাত্রই কাব্য। এইজন্য সাধারণতঃ রসগর্ভ কথামাত্রই কবিকথা বা কাব্যালাপ নামে প্রচলিত। এই কাব্যালাপ বা কবিকথানুশীলনার প্রলোভনও বড় কম নয়। ইহাতে আমোদ আছে, আত্মপ্রসাদ আছে, রসসিক্ত উপদেশ আছে। এই সকল আছে বলিয়াই সামাজিক লোক সহজে ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

কেবল ইহাই নহে। আলঙ্কারিকেরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,—কাব্যসেবায় মোক্ষফলও করায়ত্ত হয়। সুতরাং এত বড় প্রলোভনের সামগ্রী বিজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ, কোন সমাজ হইতেই অনাদরে উপেক্ষিত হইবার নয়। তাই অনাদিকাল হইতেই বড় বড় কবি-কৃত দৃশ্য বা শ্রব্য কাব্যে কিম্বা সাধারণ কবিকথালাপে বা রসানুবিদ্ধ প্রবন্ধ-প্রস্তাবে উচ্চ নীচ সকল সমাজেরই একটা অনুরাগ-ধারা বিদ্যমান।

সমাজের এইরূপ অনুরাগের ফলেই কবিকথাপ্রসঙ্গে বৃদ্ধ-পরম্পরায় বহু বিচিত্র প্রবাদ বা কিংবদন্তীর মধ্য দিয়া নানা রসভাবময়ী বচনরচনা আজও সমাজে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য এই সকল প্রবাদবচনের অনেকাংশ অসত্য হইতে পারে; কিন্তু ইহার অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় যে রসতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাতে এমন সহৃদয় কে আছেন, যাঁহার হৃদয়ে না অজস্র আমোদ আনন্দ ঢালিয়া দেয়?

দুঃখের বিষয়, এ আমোদ-আনন্দ উপভোগের উপকরণ এখন লুপ্তপ্রায়। এক একটী বৃদ্ধ ধরাধাম ছাড়িয়া যাইতেছেন, কে বলিতে পারে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কত অতীত রসকাহিনীও না চিরবিদায় লইয়া

যাইতেছে? যদিও সুদূর পল্লীমণ্ডপে বা রসিক-জন-সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ক্বচিৎ কোথাও কিয়দংশে ইহার চর্চ্চা এখনও আছে, কিন্তু দূর ভবিষ্যতে ইহা থাকিবে কি না, জানি না। কেন না, আধুনিক শিক্ষা, সঙ্গ, সভ্যতা—এ আমোদ-উপভোগের শুভাবসর প্রায়ই পায় না,—পাইলেও উপকরণ অভাবে সে উপভোগ-আকাঙ্ক্ষার পূর্ত্তি ঘটাইতে পারে না।

এ কারণ আমার এই প্রয়াস-ফল—'রসাল' শিক্ষিত সহৃদয় জনের আমোদ উপভোগের সহায়তার জন্যই প্রস্তুত। জানি না, ইহাতে তাহা কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

'রসালে' সংস্কৃত-অসংস্কৃত বহু বিচিত্র প্রবাদ-প্রবচনের সমাবেশ ঘটনা করিয়াছি। বাল্যে পঠদ্দশায় বা বৃদ্ধমুখে যেমনটী যাহা শুনিয়াছি, রসোপাদানের সমাহার-বোধে সকলই ইহাতে সংগ্রহ করিয়াছি।

'রসালের' শাখাভেদে স্বর্গোদ্যানের পারিজাত গাঁথিয়াছি, আবার মর্ত্তের রজনীগন্ধা-গন্ধরাজও মিলাইয়াছি;—শুদ্ধান্তচারিণী রাজবধূকে বসাইয়াছি, আবার চুনোগলির পটাচুন্নীকেও স্থান দিয়াছি। এখন এই বিচিত্র সমাবেশের রসরহস্যময় কথাবতারণায় 'রসাল' সকলের প্রিয় হইলেই আমায় প্রয়াসের সাফল্য বোধ করিব। হইতে পারে ইতিপূর্ব্বে আরও বা কেহ এ পথে পদার্পণ করিয়াছেন; কিন্তু আমার এ প্রয়াসের অভিনবত্ব বিচার পাঠকবর্গই করিবেন ইতি।

বিনীত—

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

(প্রথম শাখা)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। চতুরে চাতুরী	১
২। কবিতার দাম লক্ষ টাকা	৭
৩। নষ্টের আর গতি কি	১৩
৪। দাসীবাক্যে পলায়ন	১৫
৫। বড় শীত	১৮
৬। বড় কে	১৯
৭। কর্ণাটে কালিদাস	২৪
৮। কবি দণ্ডী	৩৮
৯। লুব্ধযুবক—সন্ন্যাসী	৪০
১০। লোভী গুরু	৪১
১১। বিরহিণী	৪৫
১২। 'হাত-চালান'	৫২
১৩। যোগ্য ছাত্র	৫৬
১৪। কবিরাজ ও মহামহোপাধ্যায়	৫৭
১৫। কৃপণের কথা	৫৯
১৬। আর একটী 'হাত-চালান'	৬১
১৭। অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা	৬৩
১৮। তর্পণ	৬৫
১৯। শাক্ত ও বৈষ্ণব	৬৮

বিষয়		পৃষ্ঠা

২০। নূতন দরিদ্র ৭২
২১। সাহেবের সংস্কৃতানুরাগ ৭৪
২২। যরী, রলা, ইরং, নয় ৭৮

(দ্বিতীয় শাখা)

২৩। ভাবুকতা ৮১
২৪। মাথায়—'না' ৮২
২৫। উদার ধনী ৮৩
২৬। দারোগা 'ম'শায় ভাল লোক ৮৭
২৭। পরীক্ষা ৯০
২৮। কথকতার কথা ৯১
২৯। নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত ৯২
৩০। স্বপ্ন-দর্শন ৯৩
৩১। আমি অনাথ ৯৪
৩২। মামলাবাজী ৯৪
৩৩। দুইটা ও একটা ৯৬
৩৪। কিছু লাভ ১০০
৩৫। উত্তম উত্তর ১০২

রসায়ন

প্রথম শাখা।

চতুরে চাতুরী।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবিখ্যাত ভোজরাজ রাজত্ব করিতেন। ভোজরাজ একজন গুণী জ্ঞানী বিজ্ঞ বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। মধ্যভারতের উজ্জয়িনীতে মহারাজ-চক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য যেমন সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্বগুণের আধার বলিয়া সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহাঁর শ্বশুর ভোজরাজও তেমনি বিদ্যা ও গুণ-গৌরবে বিশ্ববরেণ্য হইয়াছিলেন। এই ভোজরাজ যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন ইহাঁর রাজধানী 'ধারা' নগরীতে এইরূপ একটী দৈববাণী হইয়াছিল যে,—

"অদ্য ধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতা মণ্ডিতাঃ সর্ব্বে ভোজরাজে ভুবং গতে॥"

অর্থাৎ ভোজরাজ ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ায় আজ ধারা নগরী সজ্জনের আধার হইল। সরস্বতী একটী সদবলম্বন প্রাপ্ত হইলেন, আর পণ্ডিতবর্গ সম্মানভাজন হইয়া উঠিলেন।

এ হেন ভোজরাজের যখন মৃত্যু হয়, তখন আবার ঐ দৈববাণীর পদগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ হইয়াছিল ; যথা:—

"অদ্য ধারা নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী।
পণ্ডিতাঃ খণ্ডিতাঃ সর্ব্বে ভোজরাজে দিবং গতে॥"

অর্থাৎ ভোজরাজ স্বর্গারোহণ করায় অদ্য ধারা নগরী নিকৃষ্ট জনের আধার হইল। সরস্বতী যোগ্য পাত্র হারাইলেন ; আর পণ্ডিতগণ সম্মানচ্যুত হইয়া পড়িলেন।

অনেকে মনে করেন, এই ভোজরাজই ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রবর্ত্তক। তাই এখনও উহা ভোজবাজী বা ভোজের বাজী নামে অভিহিত। যাহাই হউক, এ হেন ভোজরাজ যখন পূর্ণোদ্যমে তাঁহার সিংহাসনে সমাসীন, তখনকার একটী ঘটনার কথা বলি। ঘটনাটা এই,—

উজ্জয়িনীতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভা ছিল। মহারাজের শ্বশুর ভোজরাজও সেইরূপ নবরত্ন-সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভোজরাজের এই সভা হইতে এক সময় ঘোষণা করা হয় যে, যদি কোন নবাগত নূতন কবি এ সভায় আসিয়া নূতনভাবের নূতন কবিতা বা রচনা শুনাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই ঘোষণা শুনিয়া নানা দেশ হইতে অনেক কবিই রাজসভায় আসিলেন; কিন্তু কেহই নূতন শুনাইয়া রাজসভার প্রতিশ্রুত পুরস্কার লইয়া যাইতে পারিলেন না। এ ব্যাপারে ভোজরাজের মনে বেশ একটু অহঙ্কার হইল। তিনি ভাবিলেন, —আমার সভায় যে সকল পণ্ডিত আছেন, ইহাঁদের অবিদিত নূতন কথা এ যাবৎ কেহই শুনাইতে পারিলেন না; সুতরাং মনে হয়, আমার এই পণ্ডিতপরিষৎই এ ভারতে অদ্বিতীয়।

আসল কথা এই যে, ভোজরাজসভার যিনি প্রধান পণ্ডিত, তিনি ছিলেন শ্রুতিধর; কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব কবিতা বা গদ্য রচনা শুনিবামাত্র তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। এইরূপে সে সভার যিনি দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার দুই বারে, তৃতীয় পণ্ডিতের তিন বারে, চতুর্থ জনের চারি বারে, পঞ্চম জনের পাঁচ বারে,—এইভাবে ক্রমশঃ একাধিক বারে নয় জন পণ্ডিতেরই তাহা মুখস্থ হইত। কাজেই কেহ আসিয়া কোন নূতন কবিতা বা রচনা শুনাইলেই শোনামাত্র যাঁহার কণ্ঠস্থ হইত, সেই শ্রুতিধর পণ্ডিত বলিতেন, এটা আমি জানি। এই বলিয়া তিনি আবৃত্তি করিয়া ফেলিতেন।

আগন্তুকের প্রথম আবৃত্তি আর শ্রুতিধর সভাপণ্ডিতের দ্বিতীয় আবৃত্তি,—এই দুই বারের আবৃত্তি শুনিয়া দ্বিতীয় সভা-পণ্ডিত—যাঁহার দুইবার শুনিলে কণ্ঠস্থ হইত—তিনি বলিয়া উঠিতেন,—হাঁ এটা আমিও তো জানি। এই বলিয়া তিনি

আবৃত্তি করিয়া উঠিতেন। মোট এই তিন বার আবৃত্তি হইল। তিন বারের আবৃত্তি শ্রবণে যাঁহার মুখস্থ হইত, এই বার সেই তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিতেন,—হাঁ এটা আমারও তো জানা ছিল। এই বলিয়া তিনিও আবৃত্তি করিয়া উঠেন। এইরূপে এক এক বারের অধিক আবৃত্তি শ্রবণে ক্রমশঃ নয় জন পণ্ডিতেরই যেন সেটা জানা বিষয় হইয়া দাঁড়াইত; কাজেই নূতন শুনাইয়াছি বলিয়া সে সভায় কেউ 'কল্‌কে' পাইতেন না। যিনিই যাইতেন, প্রতিশ্রুত পুরস্কার না পাইয়া সকলকেই ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিতে হইত।

ক্রমে উজ্জয়িনীর রাজ-সভায় এক দিন এই বিষয়ের আলোচনা হইল। এ সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন কালিদাস সব কথা শুনিলেন, মনে মনে একটু হাসিলেন; প্রকাশ্যে বলিলেন,—ভোজরাজের সভায় আমিই গিয়া নূতন কবিতা শুনাইব। সভাস্থ সকলেই এ কথায় আনন্দিত হইলেন।

কবি কালিদাস কৌতূহলবশতঃ সেই দিনই ভোজরাজের রাজধানী উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

এক দিন ভোজরাজ পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া রাজসভায় সমাসীন। এই সময় এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাজাকে সসম্ভ্রমে বলিলেন,—মহারাজ! আমি একজন বিদেশী কবি; আপনাকে নূতন কবিতা বা রচনা শুনাইয়া আপনার পণ্ডিতসভা হইতে ঘোষিত লক্ষমুদ্রা পুরস্কার পাইতে চাই।

রাজা বলিলেন,—হাঁ আপনি নূতন শুনাইতে পারিলেই আমাদের প্রতিশ্রুত লক্ষমুদ্রা অবশ্যই পাইতে পারিবেন।

আগন্তুক পণ্ডিত বলিলেন,—তবে শ্রবণ করুন—

"স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবনবিজয়ী, ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী,
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটির্ম্মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি শীঘ্রং সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ,
নো বা জানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতিচেদ্ দেহি লক্ষং ততো মে॥"

অর্থাৎ হে ভোজরাজ, আপনি ত্রিভুবনবিজয়ী, ধার্ম্মিক এবং সত্যবাদী। আপনার মঙ্গল হউক। পরন্তু ভবদীয় পিতা আমার নিকট হইতে এক কোটি নবনবতি রত্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি সেই রত্ন আমাকে সত্বর প্রদান করুন। ইহা যে সত্য কথা, তাহা আপনার সভাস্থ সকল পণ্ডিতই অবগত আছেন। তবে যদি ইহারা বলেন যে, ইহা আমরা কেউ জানি না; তাহা হইলে ইহা আমার নবকৃত। যদি নবকৃতই হয়, তাহা হইলে আপনার প্রতিশ্রুত লক্ষমুদ্রা আমাকে প্রদান করুন।

আগন্তুক কবির এই কবিতা-রচনা শুনিয়া সভাস্থ সকল পণ্ডিতই নীরব। তাঁহারা এখন আর কেহই বলেন না যে, ইহা আমরা জানি। 'জানি' বলিলে আগন্তুককে বহু লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে হয়। আর 'জানি না' বলিলেও প্রতিশ্রুত

লক্ষমুদ্রা দিতে হয়। সভাসদ্‌গণ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। অবশেষে আগন্তুককে লক্ষমুদ্রা দেওয়াই স্থির হইল।

বলা বাহুল্য, এই আগন্তুক কবিই আমাদের সেই কালিদাস। কবি কলিদাসের নাম ভোজরাজ অনেক শুনিয়াছিলেন, কবির সহিত চাক্ষুষ পরিচয় তাঁহার ছিল না। যখন পরিচয়ে জানিলেন, পুরস্কারপ্রাপ্ত আগন্তুক কবি ভারতের উজ্জ্বল রত্ন— মালব-কবি সেই মহাকবি কালিদাস," তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

কালিদাস টাকা লইতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন,— অর্থের আমার অভাব নাই। আপনার পণ্ডিতসভার চতুরতা টুকু বুঝিয়াই আমার আগমন।

সেই হইতে ভোজরাজ আর নিজ সভায় পাণ্ডিত্য-প্রাধান্যের দর্প করেন নাই।

কবিতার দাম লক্ষ টাকা।

ভারবি ভারতের একজন মহাকবি। ইহাঁর কবিত্বকীর্ত্তি,—কিরাতার্জ্জুনীয়। কিম্বদন্তী এই যে, ভারবি অর্থার্জ্জনের দিকে মোটেই মন দিতেন না; কবিত্ব-মদিরাপানেই সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া থাকিতেন।

এদিকে ভারবির সাংসারিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া উঠিল, অথচ সে দিকে তাঁহার দৃক্‌পাতও নাই।

একদিন কবিগৃহিণী বলিলেন,—কান্ত, আপনি তো কবিতা লইয়াই আছেন। এদিকে যে অর্থ বিনা সংসার ক্রমেই অচল হইয়া পড়িল। কবিতায় কি হইবে? চাই অর্থ, নহিলে যে সংসারের লোক না খাইয়া মরিবে।

ভারবি হাসিয়া বলিলেন,—ওঃ! তুমি অর্থের কথা কহিতেছ? আচ্ছা, আমার এই কবিতাই অর্থ আনিবে। আমি কোথাও যাইতেছি না; যেমন আছি থাকিব। তুমি আমার এই সদ্য-রচিত কবিতাটী লইয়া গিয়া কোন হাটে বা বাজারে বিক্রয় করিয়া আইস। ইহার মূল্য লক্ষ মুদ্রা। লক্ষ মুদ্রার কমে ইহা বিক্রয় করিও না।

কবি-গৃহিণী ভাবিলেন,—একটা কবিতা কিনিবে কে? সে কবিতার দাম আবার লক্ষ টাকা! আশ্চর্য্য বটে। যা' হউক,

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি ! প্রকাশ্যে বলিলেন, তবে দিন— আপনার কবিতা, আমি এখনই উহা বেচিতে যাইব। কবি ভারবি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সদ্য-রচিত কবিতাটী একটা তালপত্রে লিখিয়া দিলেন। কবি-গৃহিণী কৌতূহলবশতঃ সেই সময়ই তাহা লইয়া কোন হাটের উদ্দেশে চলিলেন।

কবিগৃহিণী কবিতাটী লইয়া স্বগ্রাম হইতে বহুদূরে গেলেন। তিনি যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন, অতি নিকটে একটী নূতন হাট বসিয়াছে। এক ধনাঢ্য বণিক এই হাটের মালিক। বণিক্ ঢোল-সহরতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যদি কোন বিক্রেতার মাল আমার এই নূতন হাটে অবিক্রীত থাকিয়া যায়, তবে আমি নিজেই তাহা কিনিয়া রাখিব।

এই সংবাদে কবি-গৃহিণী খুব আশ্বস্ত হইয়া সেই হাটের দিকেই গমন করিলেন ; গিয়া দেখিলেন,—বহু জনপূর্ণ হাট, তন্মধ্যে প্রবেশ করা অসাধ্য ; সুতরাং যেখানে লোকের ভিড় নাই, হাট-সংলগ্ন এমন একটী স্থানে এক বটবৃক্ষমূলে তিনি সেই তালপত্র-লিখিত কবিতাটী লইয়া বসিলেন। অনেক ক্রেতা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল, কেহ কেহ উঁকি মারিয়া তালপত্রে কি লেখা আছে, পড়িবার চেষ্টা করিল ; কেহই কিছু বুঝিল না, চলিয়া গেল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। হাট ভাঙ্গিল। লোকজন যে যা'র স্থানে চলিয়া গেল। কিন্তু কবিগৃহিণী তখনও সেখানে

বসিয়া। নিয়মানুসারে বণিকের লোক হাট দেখিতে বাহির হইল। তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহারও কোথাও অবিক্রীত মাল আছে কি না, দেখিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের দৃষ্টি অবগুণ্ঠনবতী কবিগৃহিণীর প্রতি পড়িল। তাহারা কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে মা, তুমি কি দ্রব্য লইয়া বসিয়া আছ?

কবি-গৃহিণী বলিলেন, বাপ সকল! আমি এই নূতন হাটে একটী কবিতা বেচিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু কেহই কিনিল না। বণিকের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার এ কবিতার দাম কত?

কবিগৃহিণী উত্তর করিলেন,—ইহার দাম লক্ষ টাকা।

একটা কবিতার দাম লক্ষ টাকা, শুনিয়া বণিক্-কর্ম্মচারীরা বিস্মিত এবং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল। তাহারা সকলেই গিয়া বণিকের নিকট এই অপূর্ব্ব সংবাদ জ্ঞাপন করিল। বণিক্ এই সংবাদ শুনিয়া নিজেই কবি-গৃহিণীর নিকট আসিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কবিতাটী চাহিয়া লইয়া পড়িলেন; পড়িয়া বলিলেন, —বহুৎ আচ্ছা, আমি লক্ষ টাকায় ইহা ক্রয় করিলাম। কবি-পত্নীকে লক্ষ টাকা দিয়া নিরাপদে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। কবিপত্নী পরমানন্দে গৃহে গিয়া পৌঁছিলেন।

এদিকে বণিক্ সেই বহুমূল্য কবিতাটী আনিয়া মনের সাধে নিজ শয়নকক্ষের দেওয়ালে পেরেক মারিয়া অতিযত্নে রাখিয়া দিলেন। কবিতাটী এমন স্থানে রহিল যে, তিনি শয়ন করিলে

একবার না একবার সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িতই। কবিতাটীর দিকে বণিক যখনই দৃষ্টিপাত করিতেন, অমনি তাঁহার অন্তরে কি যেন এক গভীর উপদেশের ভবিষ্য মঙ্গলচ্ছবি অঙ্কিত হইয়া

একে একে বহু দিন অতীত হইল। বণিক্ বাণিজ্য করিবার জন্য একবার বিদেশ যাত্রা করিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে বণিকের প্রচুর লাভ হইতে লাগিল। বণিক স্ত্রী-পরিবার ভুলিয়া অর্থলোভে একাদি ক্রমে পঞ্চদশ বর্ষ বিদেশ-বাসে কাটাইলেন।

একদা তাঁহার দেশে আসিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। তিনি বহু বাণিজ্যতরী সঙ্গে লইয়া দেশে আসিলেন। তাঁহার বাণিজ্য-তরীগুলি যখন ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রিকাল। বণিক্ নিজভবনে সংবাদ পাঠাইলেন। বণিকের আত্মীয়বর্গ সানন্দে তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া লইয়া গেলেন।

বণিক্ কিছুক্ষণ আত্মীয় স্বজনের সহিত পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীর সহিত বহুকাল পরে সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু দীর্ঘপ্রবাসের পর পরস্পর পরস্পরের আমূল সংবাদ আদান-প্রদান যেরূপ হওয়া উচিত, এ সময়ে তাহা আর হইল না। বণিকের শরীর একটু অসুস্থ ছিল; তাই তিনি অবিলম্বেই শয়ন-কক্ষে বিশ্রাম করিতে গেলেন। বণিকপত্নী কি একটু গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া আসিবার জন্য সত্বর গৃহান্তরে গমন করিলেন।

এদিকে বণিক্ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন,—তাঁহার পালঙ্কোপরি কে এক পরম সুন্দর যুবা নিদ্রা যাইতেছে। দেখিয়াই বণিকের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অসি কোষমুক্ত করিলেন এবং যুবা পুরুষের কণ্ঠ উদ্দেশে সজোরে আঘাত করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। কিন্তু যেই মাত্র আঘাত করিবার উপক্রম করিলেন, অমনি অসির অগ্রভাগ, সেই লক্ষ টাকায় ক্রীত কবিতাসংলগ্ন দেওয়ালে ঠেকিয়া আঘাতচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। বণিক্ সচকিতে তাকাইয়া দেখিলেন,—তাঁহার সেই সাধের কবিতা। আর তাহাতে লেখা,—

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ।"

এই কবিতাটীর অর্থগ্রহ বিজ্ঞ বণিক্ পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি কবিতার মর্ম্ম এইরূপ বুঝিয়াছিলেন যে, সহসা কোন কার্য্য করিতে নাই। অবিবেচনার সহিত কার্য্য করিলে তাহা আপদের আস্পদ হইয়া থাকে। যিনি বিবেচনার সহিত কার্য্য করেন, গুণলুব্ধ সম্পদরাশি তাঁহাকে আপনা হইতেই বরণ করিয়া লয়।

কবিতার দিকে দৃষ্টি দিয়াই বণিক্ হত্যাচেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। ইতিমধ্যে বণিক-পত্নী আসিয়া উপস্থিত। বণিক্ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলেন,—ব্যাপার কি? এ কে আমার পালঙ্কে?

বণিকপত্নী সহাস্য-বদনে বলিলেন,—এ আপনার বংশধর পুত্র। বণিক্ চমকিয়া উঠিলেন। বণিক্-পত্নী বলিলেন,—আপনার মনে পড়ে, আপনি যখন বাণিজ্যার্থ বিদেশ যাত্রা করেন, তখন আমার পঞ্চম মাস গর্ভাবস্থা ছিল। এই কথাকয়টী বলিবামাত্র বণিকের সকল কথা স্মরণ হইল। বণিক্ কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—ওঃ! আজ কি সর্ব্বনাশই করিতে গিয়াছিলাম! আমার ষোড়শবর্ষীয় যুবা পুত্রকে আমি না জানিয়া হত্যা করিতেছিলাম। আজ আমার টাকা সার্থক। ঐ কবিতা আমার পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়া দিল।

নষ্টের আর গতি কি ?

একবার এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় নানা পণ্ডিত-সভা জয় করিয়া অবশেষে উজ্জয়িনীর নবরত্ন সভা জয় করিতে আসিলেন। এই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের একটী সমস্যা ছিল,—'নষ্টস্য কান্যা গতিঃ'। এই সমস্যার মনোমত পূরণ এ যাবৎ কোন পণ্ডিত-সভায়ই হয় নাই। উজ্জয়িনীর সভাতে অন্যান্য সমস্যার সহিত তিনি এই সমস্যাটীরও উল্লেখ করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন।

চারিদিকে রাষ্ট্র হইল,—এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত উজ্জয়িনীর পণ্ডিতসভায় আসিতেছেন। তাঁহার শিবিকা উজ্জয়িনীর রাজপথ দিয়া আসিতেছে।

কালিদাস এই সংবাদ পাইবামাত্র একটু মজা করিবার জন্য সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত ছাপ লাগাইয়া—একখানি নামাবলী উত্তরীয়-রূপে রাখিয়া—রাজপথ-পার্শ্ববর্ত্তী এক কসাইর দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কসাইর সহিত মাংসের দর কসাকসি করিতে লাগিলেন।

এই সময় দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শিবিকারোহণে সেই পথে আসিয়া উপস্থিত। কালিদাস তখন মাংসের দর লইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একটু উচ্চরোলে তর্ক আরম্ভ করিলেন। দিগ্‌বিজয়ী

পণ্ডিতের দৃষ্টি সহসা সেই বৈষ্ণববেশী মাংসক্রেতার দিকে পড়িল। তিনি শিবিকাবাহকদিগকে থামাইয়া সবিস্ময়ে মাংসক্রেতাকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ;—আর ছদ্মবেশী কালিদাস উত্তর দিতে লাগিলেন ;—

প্রশ্ন—"ভিক্ষো মাংসনিষেবণং প্রকুরুষে ?

[হাঁ হে ভিক্ষু, তুমি মাংস খাইয়া থাক ?]

উত্তর—"কিন্তেন মদ্যং বিনা ?

[শুধু মাংসে কি হয়, সঙ্গে যদি মদ না থাকে ?]

প্রঃ—"মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং ?—

[মদও কি তোমার প্রিয় ?]

উঃ—"প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।

[অহো প্রিয় বটে, কিন্তু বেশ্যাগণ সহ।]

প্রঃ | "বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং ?—

| বেশ্যা হইল অর্থপ্রিয় ; তোমার ধন কোথায় ?]

উঃ—"দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা,—

[জুয়া খেলা ও চৌর্য্য দ্বারা আমার ধন ?]

প্রঃ—"চৌর্য্যদ্যূতপরিগ্রহোঽপি ভবতঃ ?—

[জুয়াখেলা কিম্বা চৌর্য্যও কি তুমি করিয়া থাক ?]

উঃ—"নষ্টস্য কান্যা গতিঃ ॥"

[নষ্টের আর গতি কি ?]

দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের যে সমস্যার পূরণ অন্যত্র ভালরূপ

হয় নাই, উজ্জয়িনীর রাজপথে একজন সাধারণ ভিখারীর মুখে তাহার সুন্দর পূরণ হইয়া গেল দেখিয়া তিনি একেবারে চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন,—উজ্জয়িনীর পথেই এই, না জানি পণ্ডিত-সভায় আমাকে অপ্রতিভই বা হইতে হয়! এই মনে করিয়া তিনি আর নবরত্নসভায় গেলেন না।

দাসীবাক্যে পলায়ন।

একবার এক বিদেশাগত পণ্ডিত উজ্জয়িনীর নবরত্ন-সভায় আসিয়া বিচার-বিতর্কে তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে হারাইয়া দিলেন। কালিদাস এ দিন নবরত্ন সভায় উপস্থিত ছিলেন না। বিদেশী পণ্ডিত, কালিদাসের সহিত বিচার না করিয়া যাইবেন না; কাজেই সেদিন তিনি অপেক্ষা করিলেন। যথাকালে সভার বিবরণ কালিদাসের কাণে পৌঁছিল। কালিদাস ভাবিলেন,—মুখোমুখি বিচার করা হইবে না, কৌশলেই ইহাঁকে হারাইব! এই ভাবিয়া সে দিন রাত্রিশেষে তিনি এক দাসীর বেশ ধরিলেন এবং কক্ষে কলসী লইয়া শিপ্রাতটে জল আনিতে গেলেন। নবাগত পণ্ডিত সেই ঘাটেই ভোরে স্নানাহ্নিক করিতে গিয়াছিলেন। দাসীবেশী কালিদাস জলকলসী কক্ষে লইয়া সেই পণ্ডিতের প্রতি বার বার

তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন। পণ্ডিত দাসীর তীব্র দৃষ্টিতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"কিং মাং নিরীক্ষসি ঘটেন কটিস্থিতেন,
বক্ত্রেণ চারুপরিমীলিতলোচনেন।
অন্যং নিরীক্ষ পুরুষং তব কর্ম্ম-যোগ্যং,
নাহং ঘটাঙ্কিতকটিং প্রমদাং স্পৃশামি॥"

অর্থাৎ কটীতে তোমার জলকলসী,—মুখমণ্ডলে তোমার সুবিন্যস্ত সুন্দর নয়ন দুইটী, তুমি কেন আমার দিকে তাকাইতেছ? তোমার কর্ম্মক্ষম অন্য পুরুষের দিকে তুমি দৃষ্টিপাত কর; ঘটাঙ্কিত-কটী প্রমদাজনকে অর্থাৎ জলবাহিনী দাসীজনকে আমি স্পর্শও করি না।

ইহা শুনিয়া দাসীবেশী কালিদাস উত্তর করিলেন,—

"সত্যং ব্রবীষি মকরধ্বজবাণপীড়,
নাহং ত্বদর্থমনসা পরিচিন্তয়ামি।
দাসোঽস্তি মে বিঘটিতস্তব তুল্যরূপী,
সো বা ভবেন্নহি ভবেদিতি মে বিতর্কঃ।"

অর্থাৎ ওহে কামশর-জর্জ্জরিত! তোমার যেরূপ ধারণা, তদনুসারে তুমি সত্যই বলিয়াছ; আমি কিন্তু তোমাকে মনে করিয়া কিছুই চিন্তা করিতেছি না। তবে তোমার তুল্যাকৃতি এক ভৃত্য আমার আজ হারাইয়া গিয়াছে; এই সেই আমার ভৃত্যটী কিনা, ইহাই আমি ভাবিতেছিলাম।

বিচারজয়ী নবাগত পণ্ডিত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন,—বাপ্‌রে, মাগীটা বলে কি ? একটা দাসী সদ্য সদ্য সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া এমন কড়া উত্তর দিল ! এ দাসী কে ? জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার প্রভু কে ? কাহার তুমি দাসী ?

দাসীবেশী কালিদাস উত্তর করিলেন,—নবরত্নসভার শ্রেষ্ঠরত্ন কালিদাসের আমি দাসী ।

উত্তর শুনিয়া নবাগত পণ্ডিত কালিদাসের সহিত বিচারাশা পরিত্যাগ করিলেন ; ভাবিলেন,—যাহার দাসী এমন বিদুষী, তাহার সহিত আমার বিচার ! আমি আজই এ স্থান পরিত্যাগ করিব । পণ্ডিত সেই দিনই পলায়ন করিলেন ।

বড় শীত।

মাঘ মাস। খুব কন্‌কনে হাড়-ভাঙ্গা শীত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য রাজসভায় সমাসীন। তিনি সভাস্থ কবি কালিদাসকে জিজ্ঞাসিলেন,—কবিবর! কেমন শীত?

কালিদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—

"নরক্রোড়গতো বহ্নির্বহ্নিকোণগতো রবিঃ।

দিবসাঃ ক্ষয়মায়ান্তি রাজন্ শীতস্য কা কথা?"

অর্থাৎ—রাজন্! শীতে অগ্নি নরের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন, সূর্য্য অগ্নিকোণে গিয়াছেন; আর দিনগুলি শীগ্‌গির শীগ্‌গির পালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং শীতের আর কথা কি?

শীতকালে লোকে আগুন কোলে করিয়া বসে, দক্ষিণায়নে সূর্য্য অগ্নিকোণে যান, আর দিনগুলিও ছোট হইয়া যায়, এই তিনটী স্বাভাবিক; কিন্তু কবি শীতের তীব্রতা এমনই ভাবে বর্ণন করিলেন, যেন শীতের ভয়েই আগুণ লোকের কোলে গিয়াছেন, আর তেজোময় সূর্য্যও শীতের ভয়েই যেন অগ্নিকোণ আশ্রয় করিয়াছেন। স্বল্প ভাষায় কি সুন্দর কবিত্ব! রাজা পরম তুষ্ট।

বড় কে ?

উজ্জয়িনীর সুধীসমাজে কালিদাসের সম-সাময়িক আরও একজন কবি-কোবিদের পরিচয় আমরা পাই। ইহার নাম বররুচি। বররুচি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। কবিত্বে ইনিও বড় 'কেও কেটা' ছিলেন না। কালিদাসের কবিযশঃসম্মান-ভাজন নামের সঙ্গে ইহারও নাম তখন সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইত। এমন কি সেকালে কালিদাস ও বররুচির পক্ষপাতী ভাবুকসমাজে দুইটা দল পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কালিদাসের কবিত্বানুরাগী দল কালিদাসকেই মহাকবির আসনে বসাইতেন; বররুচির পক্ষপাতীরা বররুচিকেই ধরণ্যে মহাকবি বলিয়া ঘোষণা করিতেন। উভয় কবিরই কবিত্ব-সৌরভে নিরপেক্ষ সুধীসমাজ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন; সুতরাং কে যে উভয়ের মধ্যে বড় কবি, তাহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারিতেন না।

এই উভয় কবি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে, বররুচির আরাধ্য দেবতা ছিলেন—মনসা দেবী; আর কালিদাসের—মা সরস্বতী। একদিন 'কালিদাস বড়, কি বররুচি বড়' এই কথা লইয়া যখন আলোচনা চলিতেছিল, তখন মনসাদেবী মায়া করিয়া একটী বালিকারূপে সে সভায় প্রবেশ করিলেন এবং

সভাসদ্‌গণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—আপনাদের কথার মীমাংসা আমি করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি বলিলেন,—

"কবয়ঃ কালিদাসাদ্যা বররুচির্মহাকবিঃ।"

অর্থাৎ কালিদাসাদি কবিমাত্র, আর বররুচি হইলেন—মহাকবি।

এই বালিকার কথায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত। তাহাদের মনে এটা একটা দৈবী উক্তি বলিয়াই ধারণা হইল। কালিদাস-ভক্ত-দলের কিন্তু এ উক্তি সহ্য হইল না। তাঁহারা বুঝিলেন,—নিশ্চয় ইনি বররুচির উপাস্য মনসা দেবী ছাড়া আর কেহই নহেন। একজন কালিদাসানুরাগী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন,—খুঁকী, এ কবিতার আর দুইটী চরণ তুমি বলিলেন না? বালিকা উত্তর করিলেন, আর পূরণের প্রয়োজন নাই। আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। তখন কালিদাসানুরাগী বলিলে, তবে শোনো,—আমি ইহার আর দুই চরণ পূরণ করিয়া দেই। তুমি যে বলিয়াছ—'কবয়ঃ কালিদাসাদ্যা বররুচির্মহাকবিঃ'—ইহার শেষার্দ্ধ এই যে,—

"তরবঃ পারিজাতাদ্যা স্নুহিবৃক্ষো মহাতরুঃ।"

অর্থাৎ স্বর্গোদ্যানের পারিজাতাদি হইল সামান্য তরু আর স্নুহিবৃক্ষ [কাঁটাওয়ালা মনসাগাছ] হইল মহাতরু। কেমন খুঁকী, এই না বচনের শেষার্দ্ধ? কালিদাসানুরাগী

পণ্ডিতের এই বিদ্রূপাত্মক উপস্থিত জবাবে সভাসদ্‌গণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

মনসা দেখিলেন,—ইহারা আমার মায়া বুঝিয়াছে, অতএব আমার অন্তর্দ্ধানই শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

কিন্তু দৈববচনে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগের মন কালিদাস ও বররুচির মধ্যে বররুচিকেই মহাকবির সম্মানদানে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এইবার বরপুত্র কালিদাসের মান রাখিবার জন্য সরস্বতীর আসন টলিল। সরস্বতী মায়ার আবেশে এক বিধবার বেশ ধারণ করিলেন এবং একটী মৃত-শিশু-সন্তান কোলে লইয়া উজ্জয়িনীর রাজপথের এক পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া একে একে অনেক পথিক জড় হইল এবং পথিক-দিগের মধ্য হইতে কেহ কেহ বিধবাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। বিধবা উত্তরে বলিলেন,—বাপ সকল! গত রাত্রে আমার এই পুত্রটীর মৃত্যু হইয়াছে। আমি দেবতার নিকট হত্যা দিয়া-ছিলাম। তাহাতে দেবতা প্রসন্ন হইয়া আমাকে একটী শ্লোকার্দ্ধ দিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি কেহ সুসঙ্গত ভাবে ইহার পূর্ব্বার্দ্ধ রচনা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তোমার এই মৃত পুত্র পুনরায় জীবিত হইতে পারিবে।

এই কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ক্রমে এই আশ্চর্য্য সংবাদ রাজার কাণে পৌঁছিল। নবরত্ন-সভাসীন

মহারাজ বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া মৃত সন্তান সহ বিধবাকে নিজ সভায় আনাইলেন এবং বিধবার মুখে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন,—তোমার সেই শ্লোকার্দ্ধ কৈ, দেখাও দেখি ? বিধবা এক খণ্ড কাগজ রাজাকে দেখিতে দিলেন। তাহাতে এই দুইটী চরণ লেখা ছিল, যথা—

"চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং বিনা নাসাগ্রমৌক্তিকম্।"

অর্থাৎ নাসাগ্র-লম্বিত মুক্তাটী ভিন্ন আর সবই চোরে অপহরণ করিয়াছে।

রাজা এই শ্লোকটি পড়িয়া প্রথমেই মহাকবি বররুচির হাতে উহা পূরণ করিতে দিলেন। বররুচি উহা এইরূপে পূরণ করিলেন,—

"নিদ্রাব্যস্তগলদ্‌বেণী-শ্বসৎফণিমণিভ্রমাৎ।
চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং বিনা নাসাগ্রমৌক্তিকম্॥"

ইহার অর্থ এই যে, নিদ্রাবেশে কোন যুবতীর মাথার বেণী খুলিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে শ্বসিত ফণীর মণি মনে করিয়া নাসাগ্রের মুক্তাটী চোরে অপহরণ করে নাই; তদ্ব্যতীত আর সমস্তই অপহরণ করিয়াছে।

বররুচিকর্ত্তৃক শ্লোকটীর এইরূপ পূরণ হওয়ায় মৃত সন্তানটী একবার চক্ষু চাহিয়া হাত পা নাড়িল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইল। তখন সকলেই আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বুঝিলেন—পূরণ ঠিক হয় নাই।

এইবার কালিদাসের আহ্বান হইল। কালিদাস ঐ শ্লোকার্দ্ধের এইরূপ পূরণ করিলেন,—

"অধরাঞ্জনরাগাভ্যাং গুঞ্জাফলমিতি ভ্রমাৎ
চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং বিনা নাসাগ্রমৌক্তিকম্ ॥"

ইহার অর্থ এই যে, যুবতীর অধর এবং নয়নাঞ্জনের আভায় নাসাগ্র-লম্বিত মুক্তাটী একটী গুঞ্জাফল বলিয়া মনে হইয়াছিল; তাই চোরে অন্য সব অলঙ্কারই লইয়াছে, কেবল মুক্তাফলটী [তুচ্ছ বোধে] লয় নাই।

এইরূপ পূরণ হইবামাত্র বালকটী বাঁচিয়া উঠিল। বিধবা বালকটী লইয়া সেইক্ষণেই রাজসভা ত্যাগ করিলেন।

এইবার রচনার গুণাগুণ লইয়া তর্ক বাধিল। তর্কে স্থির হইল,—বররুচির কবিত্ব পূরণ ভালই হইয়াছিল, তবে সম্পূর্ণ ভাবশুদ্ধ হয় নাই। কারণ, ফণীর মণি মাথার দিকেই থাকে, উহা পুচ্ছাগ্রে থাকে না। যুবতীর বেণীর সহিত ফণীর সাদৃশ্য ধরিতে হইলে বেণীর গোড়ার দিকেই ফণীর মাথার সাদৃশ্য মানায়। উহার অগ্রভাগের সাদৃশ্য পুচ্ছেই শোভা পায়। সুতরাং স্খলিত বেণীর অগ্রভাগটাই গলাইয়া নাসিকার দিকে আসা সম্ভবপর। সেই অগ্রভাগটাকে ফণীর পুচ্ছাংশে তুলিত করিয়া তাহাতে মণির আরোপ অস্থানগত হইয়া পড়ে। এই জন্যই উহা ভাবশুদ্ধ হয় নাই, এবং ভাবশুদ্ধ হয় নাই বলিয়াই ছেলেটী বাঁচিয়াও বাঁচে নাই। আর কালিদাসকৃত পূরণ বস্তুতই ভাবশুদ্ধ হইয়াছে।

কেন না, নাসিকায় একটী স্বচ্ছ মুক্তাফল ঝুলিতেছে। তাহার নীচেই লাল টুক্‌টুকে অধর; সে অধরের আভা মুক্তাফলে বিচ্ছুরিত; উপরে নেত্রাঞ্জন, সে অঞ্জনের কালো ছবিও স্বচ্ছ মুক্তার উপরের অংশে প্রতিফলিত। কাজেই লাল গুঞ্জাটী বোটার দিকের কালো চিহ্নটী লইয়া যেমন শোভা পায়, লাল এবং কালো আভার সংক্রমণে মুক্তাফলটীরও সেই শোভা হইয়াছিল। সুতরাং গুঞ্জাফলভ্রম ভাবশুদ্ধই বটে, আর এই ভাবশুদ্ধির জন্যই বিধবার মৃতপুত্র উজ্জীবিত। অতএব কালিদাসের কবিতাই জয়যুক্ত।

কর্ণাটে কালিদাস।

দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ কর্ণাট রাজ্য। অনাদি কাল হইতে পর পর বহু হিন্দু-নরপতিই এই কর্ণাটরাজ্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। যে সকল হিন্দু নরপতি কর্ণাট-সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ নরপতিই বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, কবি ও কবিত্বানুরাগী ছিলেন। এই সকল নরপতির মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক কর্ণাটপতিই বিদ্যানু-রাগে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই কর্ণাটপতি

নিজে যেমন বিদ্বান্ ও কবি ছিলেন, ইঁহার মহিষীও তেমনি বিদুষী ও কবিত্বশালিনী ছিলেন। কিম্বদন্তী এই যে, এই কর্ণাটপতির কবিত্ব এবং পাণ্ডিত্যানুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, ইনি এক সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন,—যদি কোন কবি-কোবিদ কাব্য-কৃতিত্বে আমায় মুগ্ধ বা চমৎকৃত করিতে পারেন, তবে যে যে দিকে মুখ করিয়া আমি বসিব, সেই সেই দিকের রাজ্য, রত্ন, রমণী— সমস্তই সেই কবি-কোবিদকে প্রদান করিব।

কর্ণাটরাজের এই বিষম প্রতিজ্ঞার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু কবি ক্রমশঃ কর্ণাটরাজ্যে আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন কবি বা কোন পণ্ডিতই আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইয়া কর্ণাট হইতে ফিরিতে পারিলেন না। রাজার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বে সকলকেই চমৎকৃত ও পরাস্ত হইতে হইত। এই আগন্তুক পণ্ডিতগণের পরাজয়ের হেতু রাজার অসীম পাণ্ডিত্য অবশ্যই স্বীকার্য্য; কিন্তু ইহার অন্তরালে আরও একটা রহস্য ব্যাপার ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কর্ণাটপতির পাণ্ডিত্যে বা কবিত্বে অবশ্যই কাহারও সন্দেহ ছিল না, আর তিনি যে সত্য সত্যই সরলভাবে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাঁহার যিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার চতুরতার জন্যই অনেক বিচারমল্ল পণ্ডিত বা কবি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। বলা বাহুল্য, এই চাতুরী-চর্চ্চায় রাজার কোনই ইঙ্গিত ছিল না। সভাপণ্ডিত ইচ্ছা করিয়াই

রাজসংসারের প্রতি তাঁহার প্রবল হিতৈষণার জন্যই প্রায়শঃ ঐরূপ চাতুরী খেলিতেন।

কর্ণাটারাজের এই সভাপণ্ডিতের নাম ছিল বল্লনকবি। বল্লন-কবি রাজার ঐ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া ভাবিলেন,—কি জানি, এ ব্যাপারে কোথা হইতে কোন্ অসীম শক্তিশালী পণ্ডিত আসিয়া কখন রাজাকে পরাস্ত করিয়া এ রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া লয়, তাহার কোনই নিশ্চয় নাই। যাহা হউক, রাজসাক্ষাৎকারপ্রার্থী পণ্ডিত-নির্ব্বাচনের ভার যখন গোড়া হইতেই আমার উপর ন্যস্ত আছে, তখন আর ভাবনা কি? আমি প্রথমতঃ আগন্তুক পণ্ডিত ব্যক্তিকে শাস্ত্রালোচনায় পরীক্ষা করিয়া লইব; যদি বুঝি, কাব্য-কৃতিত্বে বা শাস্ত্রজ্ঞানে রাজার সঙ্গে তিনি পারিয়া উঠিবেন না, তাহা হইলেই তাঁহাকে লইয়া গিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইব; আর যদি বুঝি, রাজা হয়ত ইঁহার সহিত নাও আঁটিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে নানা ছলে কৌশলে রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারে ব্যাঘাত ঘটাইব।

বল্লন-কবির এই সঙ্কল্পমতই কাজ চলিতে লাগিল। তাঁহার ব্যবস্থাগুণে তাৎকালিক অতি বড় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই তখন কর্ণাটপতির সহিত শাস্ত্রালাপ করিবার সুযোগ পাইলেন না। হয়ত রাজার বিদ্যাবৈভবে তাঁহাদিগকেও হার মানিতে হইত; কিন্তু বল্লনকবি সাহস করিয়া সেই শ্রেণীর কোন পণ্ডিতের সহিত এ যাবৎ রাজসাক্ষাৎকার ঘটাইয়া দিলেন না। তবে যাঁহারা

আসিতেন, তাঁহারা কেহই রিক্ত হস্তে ফিরিতেন না; রাজকোষ হইতে অনেক স্বর্ণমুদ্রা তাঁহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইত। কিন্তু বিদ্যার আতিশয্য দেখাইয়া কর্ণাটপতির প্রতিজ্ঞানুরূপ রাজ্য, রত্ন, রমণী—এ যাবৎ কেহই পাইতে পারিলেন না।

ক্রমে কর্ণাটপতির পাণ্ডিত্যের কথা লইয়া চারিদিকে জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। কর্ণাটপতি যে পাণ্ডিত্যজয়ী ব্যক্তিকে রাজ্য-রত্ন-রমণী-রথাদি দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে সকল যে এ যাবৎ কেহই পাইতে পারেন নাই, তাহারও আলোচনা চলিল। কিয়দ্দিনের মধ্যেই সুদূর উজ্জয়িনীর নবরত্ন-সভায় এই গৌরবময়ী কর্ণাট-কীর্ত্তি-কাহিনী পৌঁছিল। সভাস্থ সকলেই এ সংবাদে বিস্মিত হইলেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল,—কর্ণাটে গিয়া কবিকেশরী কালিদাসই নবরত্নসভার চিরগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিবেন। কালিদাস সসন্তোষে সম্মত হইলেন এবং উজ্জয়িনী হইতে যাত্রা করিয়া কয়েকদিন পরে কর্ণাট নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

কালিদাস কর্ণাট-রাজধানীতে পৌঁছিয়াই রাজার সহিত বিচার করিতে গেলেন না। তিনি এক দিন তথায় বিশ্রাম করিয়া তাঁহার অনন্যসুলভ প্রতিভাবলে সকল বিষয়েরই তত্ত্ব লইলেন। কর্ণাট-পতির প্রধান পণ্ডিত বল্লন-কবিরও প্রকৃতি-পরিচয় পাইতে তাঁহার বেশী সময় লাগিল না। তিনি প্রথম আলাপেই বল্লন-কবিকে চিনিয়া লইলেন। বল্লন-কবি রাজার সহিত বিচারোৎসুক কালি-

দাসকে পরদিন প্রভাতে আসিতে বলিয়া দিলেন। কালিদাস নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়া বল্লনকবির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের আলাপ-পরিচয় হইল। বল্লন বলিলেন,—আচ্ছা আপনি কিরূপ কবি, আপনার রচিত একটী কবিতাদ্বারা তাহার একটু পরিচয় অগ্রেই প্রদান করুন। কালিদাস কহিলেন,—আমি কোন্ বিষয়ে কবিতা রচনা করিব, তাহা আপনি বলিয়া দিন, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি—সদ্য সদ্য কবিতা রচনা করিতে পারি কি কিনা? বল্লন বলিলেন,—মহারাজ নিদ্রিত আছেন; গাত্রোত্থান করুন, এই ভাবের একটা সাময়িক কবিতা আপনি রচনা করুন।

চতুরচূড়ামণি কালিদাস বল্লনকবির অভিপ্রায় বুঝিয়া আত্মশক্তি চাপিয়া রাখিলেন, বাহিরে তাহার মনস্তুষ্টির জন্য একটী কবিতা রচনা করিয়া দিলেন।

কবিবর কালিদাসের সেই কবিতাটী এই,—

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র মুখং প্রক্ষালয়স্ব টঃ।
ইতি বৈ ভাষতে কুক্কুটঃ বৈ তু হি চ বৈ তু হি॥"

ইহার অর্থ হইল এই যে, হে রাজেন্দ্র! উঠুন উঠুন, উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করুন। প্রভাতে কুক্কুট পক্ষী যেন এই কথাই বলিতেছে।

কালিদাস অনেক সময় ভাবিয়া চিন্তিয়া এই কবিতাটী রচিলেন এবং সেই রচিত কবিতাটী বল্লন-কবির হাতে দিলেন। বল্লন কবিতা পড়িয়া মনে-মনে হাসিলেন, আর ভাবিলেন,—আহা,

কি কবিই আজ রাজার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছেন। কবির ক্ষমতা এতদূর যে, একটী চরণ কেবল 'চ বৈ তু হি' দিয়াই পূরণ করিয়াছেন। কবিতায় একটী কুক্কুট শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার 'ট' অক্ষরটী আবার অন্য চরণে গিয়া পড়িয়াছে। তারপর কবিতার ভাব!—সে তো অতি চমৎকার! যা হউক, এ কবিকে রাজার কাছে লইয়া গিয়া খুব একটা মজা করা যাইবে।

এই ভাবিয়া বল্লন-কবি কালিদাসকে লইয়া রাজসভায় গমন করিলেন। বল্লন-কবির হস্তে কালিদাসের রচিত সেই কবিতাটী; কালিদাস তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। বল্লন এই অবস্থায় রাজসভায় প্রবেশ করিয়া কর্ণাটপতির উদ্দেশে বলিলেন,—'স্বস্ত্যস্তু ক্ষিতি-নাথ।'—অর্থাৎ হে ক্ষিতিপতি! আপনার মঙ্গল হউক। রাজা বলিলেন;—'বল্লনকবে হস্তে কিমাস্তে তব'—[হে বল্লনকবে! আপনার হাতে কি?] বল্লন বলিলেন—'শ্লোকঃ' (আমার হাতে একটী শ্লোক।] রাজা বলিলেন—'কস্য কবেঃ' [কোন্ কবির কৃত?] বল্লন কালিদাসকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—'অমুষ্য কৃতিনঃ' (ইনি এই শ্লোকের রচয়িতা)। রাজা বলিলেন—'তৎ পঠ্যতাং' [তা হ'লে পাঠ করুন] এই সময়ে কালিদাস অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, 'পঠ্যতে!' (পড়িতেছি)—

কিন্ত্বাসামরবিন্দসুন্দরদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনা-
দুদ্বেল্লদ্‌ভুজবল্লিকঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম্।"

অর্থাৎ আমি শ্লোক পড়িতেছি ; কিন্তু এই অরবিন্দবৎ সুন্দর নয়না চামরধারিণীদিগের চামরব্যজনে উদ্বেলিত ভুজবল্লীর কঙ্কণ-ঝঙ্কার কিছুকালের জন্য নিবারণ করিতে আদেশ করুন। এখন মোট শ্লোকটি গিয়া দাঁড়াইল এই যে,—

"স্বস্ত্যস্তু ক্ষিতিনাথ বল্লনকবে হস্তে কিমাস্তে তব,
শ্লোকঃ কস্য কবেরমুষ্য কৃতিনস্তস্য পঠ্যতাং পঠ্যতে—
কিন্ত্বাসামরবিন্দসুন্দরদৃশাং দ্রাক্‌চামরান্দোলনা—
দুদ্বেল্লদ্‌ভুজবল্লিকঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম্।"

এ কবিতার শেষার্দ্ধ শুনিয়া রাজা তত বিস্মিত না হউন, বল্লন-কবি একবারেই বিস্ময়াপন্ন। তিনি ভাবিলেন,—কি আশ্চর্য্য! যে কবি কিছুকাল পূর্ব্বে একটী আনুষ্টুভ শ্লোক রচনা করিতে গিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছিল, তাহার মুখে এ কি অনর্গল হৃদ্য নিরবদ্য পদ্য-রচনার পরিপাটী! যা হউক, দেখি—আজিকার ব্যাপার গিয়া কি দাঁড়ায় ?

কর্ণাটরাজ আগন্তুক কবির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াই তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বলিলেন,—আপনি সকলের পশ্চাতে কেন ? আমার সম্মুখস্থ এই শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করুন। গুণ উপ-যুক্ত স্থানেই মান্য হইয়া থাকে। কালিদাস কহিলেন, রাজন্! গুণের স্থানাস্থান নাই, সর্ব্বত্রই সে মাননীয়।

কালিদাসের এই কথার উত্তরে কর্ণাটপতি তৎক্ষণাৎ একটী কবিতা রচনা করিলেন, সেই কবিতাটী এই ;

"উভৌ পক্ষৌ শুক্লৌ ভুবি বিয়তি চাব্যাহতগতিঃ,
সদা মীনং ভুঙ্‌ক্তে বসতি সকলস্থাণুশিরসি।

বকে চান্দ্রস্তুল্যো গুণসমুদয়ঃ কিঞ্চিদধিকঃ
গুণাঃ স্থানে মান্যা নচ কবিবর স্থানবিকলাঃ॥

অর্থাৎ হে কবিবর! গুণসমূহ স্থানেই উত্তম মান্য হইয়া থাকে, উহারা নিকৃষ্ট স্থানে শোভা পায় না। ইহার দৃষ্টান্ত বক ও চন্দ্র। বকের দুইটী পক্ষই শুক্ল; ভূতলে এবং আকাশে উহার গতি অব্যাহত; বক সর্ব্বদাই মীনভোজী এবং নিখিল স্থাণুশীর্ষেই উহার বসতি। আর চন্দ্র—তাঁহার একটী মাত্র পক্ষ শুক্ল, কেবল আকাশেই তিনি গতিশীল, মাসে মাত্র সওয়া দুইদিন তাঁহার মীনভোগ, আর একমাত্র স্থাণুশিরেই তিনি বাস করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বক এবং চন্দ্র তুল্য গুণশালী; বরং চন্দ্র অপেক্ষা বকে অধিক। কেননা, চন্দ্রের মাত্র এক পক্ষ শুক্ল, আর বকের দুই পক্ষই [পাখা] শুক্ল। চন্দ্র মাত্র আকাশে; বক ভূচর এবং খেচর দুইই। বক সর্ব্বদা মীন [মৎস্য) ভোজন করে. আর চন্দ্র মাসে মাত্র সওয়া দুই দিন মীন (রাশি) ভোগ করিয়া থাকেন। বক নিখিল স্থাণুশিরে (শাখাকাণ্ডহীন তরুর উপর) বাস করে, আর চন্দ্র একমাত্র স্থাণুর (মহাদেব) শিরে বাস করেন। অতএব চন্দ্র বক অপেক্ষা গুণাংশে হীন হইলেও সর্ব্বোপরি অবস্থিত বলিয়া সকলেরই মান্য।

কালিদাস কর্ণাটরাজের এই কথার উত্তরে এক কবিতা রচনা করিয়া বলিলেন,

"পুরো বা পশ্চাদ্ বা ক্বচিদুপবিশামঃ ক্ষিতিপতে।
তদা কা নো হানির্ব্বচনরচনৈঃ ক্রীতজগতাম্।
অগারে কান্তারে কুচকলসহারে মৃগদৃশাং
মণেস্তুল্যং মূল্যং সহজসুভগস্য দ্যুতিমতঃ।"

অর্থাৎ হে ক্ষিতিপতে! অগ্রে বা পশ্চাতে যে কোন স্থানেই আমরা উপবেশন করি, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? আমরা বচনরচনায় এই জগৎটাই কিনিয়া ফেলিয়াছি। বুঝিয়া দেখুন,—স্বভাবসুন্দর দীপ্তিশালী মণি অগারে কান্তারে বা সুন্দরীদিগের কুচকুম্ভ-হারে যেখানেই থাকুক, তাহার মূল্য ত' একই।

এই উত্তর শুনিয়া রস-ভাব-চতুর কর্ণাটপতির হৃদয় গলিল, গুণগ্রাহী তিনি নিজেই গিয়া কালিদাসের কাছে বসিলেন; কবির কবিত্ব-পরিচয় পাইয়া বলিলেন,—আপনার কবিতা আমি শুনিব।

এই বলিয়া রাজা সাগ্রহে শুশ্রূষু হইয়া বসিলেন। কালিদাস সদ্য-রচিত একটী কবিতার প্রথম পাদের খানিকটা মাত্র বলিয়াছেন, ইতি মধ্যে বল্লনকবির কি একটা কথা শুনিতে গিয়া রাজা একটু অন্যমনস্ক হইলেন। কালিদাস ইহা লক্ষ্য করিয়া আরব্ধ কবিতাটী না বলিয়া নূতন একটী কবিতায় রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—

"মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরধিয়া বৈমুখ্যমাকর্ণনে,
শ্রীকর্ণাটবসুন্ধরাধিপ সুধা-সিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতি নাম নর্ণবনদীভূগোলবিন্ধ্যাটবী-
ঝঞ্ঝামারুত-কাননপ্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া।"

অর্থাৎ হে কর্ণাটপতে! আমায় কিছু দিতে হইবে, এই মনে করিয়া আপনি আমার কথাশ্রবণে বিমুখ হইবেন না; আমার সুন্দর উক্তিগুলি সুধাসিক্ত বলিয়াই জানিবেন। আমি কত সময় কত নর, অর্ণব, নদ, নদী, ভূগোল, বিন্ধ্যাচল, গভীর অরণ্য, ঝঞ্ঝাবাত, মন্দ মারুত ও কাননাদির বর্ণনা করিয়া থাকি, তাহাদের নিকট হইতে আমার কি লাভ হইয়া থাকে?

কবির এই কড়া কথায় রাজা বিরক্ত না হইয়া লজ্জিত হইলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দিলেন।

কালিদাস এইবার স্বীয় কবিত্ব-শক্তির পরিচয়দানের অবসর পাইলেন। তিনি এই সময় যে সকল রচনা করেন, তাহা 'কর্ণাটবর্ণন' নামে প্রসিদ্ধ। সেই কর্ণাটবর্ণনার প্রথম কবিতাটী এই:—

"শ্রীমন্নাথ তবাননে ভগবতী বাণী নরীনৃত্যতে,
তাং দ্রষ্টুং কমলা সমাগতবতী লোলাপি বদ্ধা গুণৈঃ।
কীর্ত্তিশ্চন্দ্র-করীন্দ্র-কুন্দ-কুমুদ-ক্ষীরোদ-নীরোপমা,
ত্রাসাদম্বুনিধিং বিলঙ্ঘ্য সহসা নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতে॥"

অর্থ এই যে, কবি কালিদাস কর্ণাটপতিকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন,—হে শ্রীমন্ নরনাথ! আপনার আননে ভগবতী বাণী নিয়ত নৃত্য-নিরতা; তাঁহাকে দেখিবার জন্য কমলা আসিলেন। কমলা চঞ্চলা হইয়াও আপনার গুণে বাঁধা পড়িলেন। আপনার নির্ম্মল কীর্ত্তি—চন্দ্র, করীন্দ্র, কুন্দ, কুমুদ ও ক্ষীরোদ-জলের সহিত উপমিতা; পাছে সেই কীর্ত্তিকেও বাঁধা পড়িতে হয়, এই ভয়েই সে যেন সহসা সাগর লঙ্ঘন করিয়া দেশদেশান্তরে ছুটিয়াছে; আজও তাহার বিশ্রাম নাই। অর্থাৎ আপনার কীর্ত্তি সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

কালিদাস পরপর এইরূপ এবং অন্যরূপ বহু কবিতা রচনা করিলেন। কথিত আছে,—এই সকল কবিতা-শ্রবণে কর্ণাটরাজ মুগ্ধ হইয়া কালিদাসকে তাঁহার রাজ্যের এক এক দিক্ দান করিতে লাগিলেন। তিন দিক্ দান করা হইয়াছে, একটী মাত্র দিক্ অবশিষ্ট আছে। এই সময় রাজা 'ফরমাইস', করিলেন,—আপনি আসিবার সময় আমার প্রাসাদে বিশেষ দর্শনীয় কি দেখিয়া আসিলেন, তাহা স্বল্প ভাষায় বর্ণন করুন। কালিদাস অমনি কবিতা রচিয়া বলিলেন,—

"গেহে গেহে জঙ্গমা হেমবল্লী,
বল্ল্যাং বল্ল্যাং শারদঃ পূর্ণচন্দ্রঃ।
চন্দ্রে চন্দ্রে চঞ্চলং মীনযুগ্মং,
মীনে মীনে মান্মথঃ পঞ্চবাণঃ।"

অর্থাৎ এই প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে গতিশীল হেমলতা, আর

সেই লতায় লতায় এক একটী শরতের পূর্ণচন্দ্র, আর সেই চন্দ্রে চন্দ্রে চঞ্চল মীনযুগল অর্থাৎ আঁখিযুগল, আর সেই আঁখিতে আঁখিতে মন্মথের পঞ্চ বাণ।

ফলে, কর্ণাটরাজের প্রাসাদে যে সুন্দরী পরিচারিকাবৃন্দ ছিল, কালিদাস এই এক কবিতায় তাহাদের মনোহারিত্ব অতি নিপুণ-ভাবে বর্ণন করিলেন। এ কবিতা শুনিয়া রাজা তাঁহার অদত্ত অবশিষ্ট দিকও প্রদান করিলেন। এইরূপে রাজা যখন একে-ঘারেই 'দেউলিয়া' হইতে বসিলেন, তখন তাঁহার মহিষী ব্যস্ত হইয়া রাজসভায় আসিলেন এবং মাথায় হাত দিয়া অতি দৈন্য ও উদ্বেগভরে রাজার পশ্চাতে অধোমুখে বসিলেন। রাজা এ সময় তাঁহার গজ, বাজী, রথ, রত্ন, রাজ্য—সমস্তই কবিসাৎ করিয়া বসিয়াছেন। রাজার মনে দৈন্য নাই, অনুতাপ নাই; তিনি প্রিয় কবিকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও নিরাকুল; কিন্তু রাজা ভিন্ন আর সকলেই ব্যাকুল! কালিদাস এ ভাব লক্ষ্য করিলেন এবং আরও দেখিলেন,—কে এক অনিন্দ্য সুন্দরী মাথায় হাত দিয়া অধোবদনে রাজার পিছনে আসিয়া বসিলেন। কালিদাস এইবার সেই সুন্দরীর কথা ফুটাইবার চেষ্টা করিলেন। সেই সুন্দরীই যে বিদুষী কর্ণাট-মহিষী, তাহা কালিদাস বুঝেন নাই। কালিদাস কবিতাপ্রবন্ধে বলিলেন,—

"ন যাচে গজালীং ন বা বাজিরাজিং ন বিত্তেষু চিত্তং কদাচিন্মমৈব।
ইয়ং সুস্তনী মস্তকন্যস্তহস্তা, নবাঙ্গী কৃশাঙ্গী দৃগঙ্গীকরোতু।"

অর্থাৎ আমি গজ-বাজী চাই না, রাজ্যৈশ্বর্য্যেও আমার মন নাই, এই যে সুন্দরী মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়া আছেন, এই ক্ষীণাঙ্গী নবাঙ্গী একবার চক্ষু চাহিয়া দেখুন।

এইবার কর্ণাট-মহিষী মুখ খুলিলেন। তিনি কবিতা প্রবন্ধে বলিলেন,—

"একোঽভূন্নলিনাত্ততশ্চ পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপরঃ,
তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈশ্চিত্তং চমৎকুর্ব্বতে,
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া।"

অর্থাৎ—কবি—একজন পদ্মজন্মা, দ্বিতীয় বাল্মীকি, অপর জন বেদব্যাস; তাঁহারাই কবি—ত্রিলোকগুরু, তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি। কিন্তু অর্ব্বাচীন বা আধুনিকেরা যদি গদ্য-পদ্য-রচনায় চিত্ত চমৎকৃত করিতে পারেন, তবে আমি কর্ণাটরাজপ্রিয়া,—তাঁহাদেরও বাম চরণ মাথায় ধারণ করি।" (১)

কথিত আছে,—কর্ণাট-মহিষীর সহিতও কালিদাসের বহুকাল

(১) এই কবিতার 'দধামি' স্থানে 'দদামি' পাঠও দৃষ্ট হয়। শেষ পাদের অন্যার্থ করিয়া কেহ কেহ এই শ্লোকটী কর্ণাট-মহিষীর গর্ব্বোক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে মতে অর্থ এই যে,—আমি বিদুষী কর্ণাটমহিষী তাঁহাদের মস্তকে আমার বাম পদ ঠেকাইয়া দেই।

যাবৎ কবিতায় উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিয়াছিল। কর্ণাটে কালিদাসের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল; কালিদাস রাজদত্ত রাজৈশ্বর্য্য কিছুই গ্রহণ করিলেন না। এই ত্যাগব্যাপারে কালিদাসের মহিমা আরও প্রস্ফুট হইল। কালিদাস বলিলেন,—আমি রাজদম্পতির সহিত কবিত্বচর্চ্চায় যে আনন্দ পাইয়াছি, সে আনন্দ রাজৈশ্বর্য্য-লাভ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

কর্ণাটপতি বুঝিলেন,—ভারতে কালিদাসই একজন প্রকৃত সহৃদয় কবি। কালিদাসের তুলনা কালিদাসই।

কবি দণ্ডী।

দণ্ডী বা দণ্ড্যাচার্য্য ভারতের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। প্রায় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি এই ভারতভূমি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই কবি আকুমার ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী। ইনি সন্ন্যাসধর্ম্মানুসারে এক স্থানে বেশী দিন থাকিতেন না; কেবল বর্ষার কয়েক মাসই এক স্থানে বাস করিতেন। এই নিয়মে কবি একবার বর্ষাকালে এক রাজার আলয়ে রহিলেন। রাজা তাঁহার গুণ-পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পরম সমাদরে রাখিলেন। এই রাজাও একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, কবি ছিলেন। অনেকের মত এই যে, ইনিই 'মৃচ্ছকটিক' নামক প্রসিদ্ধ দৃশ্যকাব্যের প্রণেতা— মহারাজ শূদ্রক। রাজা শূদ্রক নিজ পুত্রকন্যাকে শিক্ষা দিবার জন্য দণ্ডী কবিকে অনুরোধ করেন। কবি বর্ষার কয় মাসের জন্য সে কার্য্যে সম্মত হন এবং এই অবকাশে তিনি 'কাব্যাদর্শ' নামক অলঙ্কার গ্রন্থ ও 'দশকুমারচরিত' নামক সংস্কৃত উপন্যাস গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা শূদ্রক দণ্ডী কবি-রচিত গ্রন্থ পড়িয়া মনে মনে কবির ব্রহ্মচর্য্যে সন্দিহান হইলেন; ভাবিলেন,—রসতত্ত্ব ও কাম-তত্ত্বে যিনি এতই অভিজ্ঞ, তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম কি সন্দেহাতীত? রাজা এইরূপ ভাবিতেছেন দেখিয়া, দণ্ডী কবি একটু হাসিয়া

রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ কবি আপনি, আপনার মুখে আমি দারিদ্র্য-বর্ণন শুনিতে ইচ্ছা করি।

রাজা দণ্ডী কবির অনুরোধে এই সময় পর পর কয়েকটী কবিতা রচনা করেন। রাজার রচিত সেই কবিতাগুলি 'দারিদ্র্যাষ্টক' নামে বিখ্যাত। তন্মধ্যে একটী কবিতা এই :—

"মদ্‌গেহে মুষলীব মূষিকবধূর্মূষীব মার্জ্জারিকা,
মার্জ্জারীব শুনী শুনীব গৃহিণী বাচ্যাঃ কিমন্যে জনাঃ।
মূর্চ্ছাপন্নশিশূনসূন্ বিজহতঃ সম্প্রেক্ষ্য ঝিল্লীরবৈঃ
লূতাতন্তুবিতানসম্বৃতমুখী চুল্লী চিরং রোদিতি।"

অর্থাৎ এক দরিদ্র বলিতেছে,—আমার ঘরে সকলেই আহার অভাবে কৃশ। ঘরের ইন্দুরটী টিক্‌টিকীর মত, বিড়ালটী ইন্দুরের মত, কুকুরটা বিড়ালের মত, আর আমার যিনি গৃহিণী, তিনি কুক্কুরীর ন্যায় কৃশ হইয়া গিয়াছেন। অন্য প্রাণীর কথা আর কি কহিব? অচেতনের কথাই বলি,—আমার ঘরে চুল্লীটী অর্থাৎ উনানটী মূর্চ্ছাপন্ন শিশু-সন্তানগুলিকে মৃত্যুকবলে পতিত হইতে দেখিয়া মাকড়সার জালে মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিয়া ঝিল্লীরবচ্ছলে বহুদিন ধরিয়াই রোদন করিতেছে। ভাবার্থ,—পাক তো দূরের কথা, উনানে আগুনই বহুদিন পড়ে নাই।

রাজ-কৃত এই দারিদ্র্য-বর্ণন শুনিয়া দণ্ডী কবি এবার একটু উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। রাজা বুঝিলেন,—আমি দরিদ্র না হইয়াও দারিদ্র্যের এরূপ বর্ণন করিতে পারিলাম বুঝিয়াই, কবি

হাসিলেন। আমি তো তবে কবির ব্রহ্মচর্য্যে সন্দেহ করিয়া অপরাধ করিয়াছি। রাজা তৎক্ষণাৎ কবির নিকট ক্ষমা চাহিলেন; বলিলেন,—কবির তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিই রসের স্বরূপ-পরিচয়ে পটীয়সী। কবির নৈসর্গিকী শক্তিই রসময়ী বর্ণনার কারণ। আমায় আপনি ক্ষমা করিবেন। কবি দণ্ডী প্রসন্নমনে বিদায় লইয়া বর্ষান্তে গভীর অরণ্যে গিয়া তপশ্চর্য্যায় নিরত হইলেন।

লুব্ধ যুবক—সন্ন্যাসী।

এক যুবক সংস্কৃত পড়িয়া কতকটা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক দিন ধরিয়া পড়াশুনা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কারণ এ দিকে যৌবন আসিল, অন্য দিকে সংসারের চাপ ঘাড়ে পড়িল। কাজেই চাই তখন অর্থ! সংসার চালাইতেও অর্থ চাই—আর যৌবনসুলভ সুখভোগ-চর্চ্চায়ও অর্থ চাই; কিন্তু সে অর্থ কোথায়? এ সংসারে কে তাহাকে অর্থ দিয়া তাহার সংসারের অভাব ঘুচাইবে? কেই বা যুবকের কামনা-পূরণের সহায় হইবে? যুবক বড়ই চিন্তাকুল। রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া ভাবিল,—সাধু-সন্ন্যাসীরা অলৌকিক শক্তিবলে অর্থের সন্ধান জানেন। আমি যদি সেরূপ কোন সাধু-সন্ন্যাসীর শরণ লইতে

পারি, তা' হ'লে আমার ইষ্টসিদ্ধি হয়। এই ভাবিয়া যুবক সে রাত্রি কাটাইল। ঘটনাক্রমে পরদিনই এক সাধুর সাক্ষাৎ মিলিল।

যুবক সাধু দেখিয়াই তাঁহার সঙ্গ লইল, সাধু যে দিকে যেখানে যা'ন, যুবক সর্ব্বকার্য্য ফেলিয়া সেই দিকে সেইখানে সাধুর কাছে কাছে ঘুরে। দুই তিন দিন এইভাবে কাটিল। সাধু যুবকের অভিপ্রায় বুঝিলেন। একদিন পথ দিয়া যাইতে যাইতে সাধু যুবককে ইঙ্গিতে ডাকিলেন। যুবক নিকটবর্ত্তী হইল। সাধু ঈষৎ হাস্য করিয়া বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুই তিনখানা ইষ্টক ঠেলিয়া দিয়া যুবককে কহিলেন,—লে' যাও। যুবক দেখিল,—তিনখানা ইটই খাঁটি নিরেট সোনা.; দেখিয়াই আনন্দ আর ধরে না। যুবক খুব আহ্লাদিত হইয়া ইট তিনখানা কুড়াইয়া লইল এবং সাধুর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে যুবকের মতি ফিরিয়া গেল। যুবক ভাবিল,—যাহারা হেলায় অশ্রদ্ধায় যেখানে সেখানে ধনরত্ন মিলাইয়া দেয়, না জানি—তাহারা যে রত্নের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে রত্ন কতই মূল্যবান্? সংসারী আমরা নিত্য অতৃপ্ত—সদা অসন্তুষ্ট; আর ইহাঁরা সদা তৃপ্ত—সদা তুষ্ট; ইহাঁদের সুখের নিকট সংসারের সুখ কিছুই নয় এই বলিয়া যুবক একটী শ্লোক পড়িয়া ফেলিল। শ্লোকটী এই,—

"সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাং।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥"

অর্থাৎ সন্তোষরূপ অমৃত পানে যাঁহারা তৃপ্ত, সেই শান্তচিত্ত সাধুগণের যে সুখ,—ধনলোভে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে যারা তাদের সে সুখ কোথায় ?

এই বলিয়া যুবক ইট তিনখানি ফেলিল, সাধুর সঙ্গ লইবার জন্য ছুটিল।

লোভী গুরু।

গঙ্গাতীরস্থ কোন প্রসিদ্ধ পল্লী হইতে এক গুরু ঠাকুর উত্তরাঞ্চলে শিষ্যবাড়ী গিয়াছেন। শিষ্যেরা জানে,—গুরুদেব নিরামিষাশী, মৎস্য-মাংস স্পর্শও করেন না। অন্ততঃ গুরু ঠাকুর মহাশয় শিষ্যবাড়ী আসিয়া হেয়-উপাদেয়-সম্বন্ধে যেরূপ ব্যাখ্যা-বক্তৃতা করেন, তাহাতে শিষ্যবর্গের ধারণা ঐরূপই ছিল। সুতরাং গুরু শিষ্যবাড়ী আসিলে, শিষ্যগণ তাঁহার নিরামিষ-ভোজনেরই বন্দোবস্ত করিয়া দিত। সেবার ঐ অঞ্চলে খুব ইলিশ মাছের আমদানি হইয়াছিল। শিষ্যালয়ে প্রায় প্রত্যহই দুই একটা করিয়া ইলিশ মাছ বাজার হইতে আসিতে লাগিল। ভর্জ্জিত মৎস্যের মিষ্ট সৌরভে গুরু আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

পরদিন ভৃত্য যখন মাছ লইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ

করে, যখন গুরু ঠাকুর মহাশয় একজন শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—হাঁ হে, তোমাদের ভৃত্য এইমাত্র হস্তে করিয়া কি একটা ধবলবর্ণ পদার্থ পুরাভ্যন্তরে লইয়া গেল ?

শিষ্য দেখিয়া আসিয়া উত্তর করিলেন,—হাঁ, ও একটা ইলিশ মাছ।

গুরু বলিলেন, তোমরা ইলিশ মাছ কাহাকে বল ? আমি একবার দেখিতে পারি কি ?

শিষ্য বাড়ীর ভিতর হইতে মাছটী আনিয়া গুরুদেবকে দেখাইল।

গুরু দেখিবামাত্র 'হাঃ হাঃ' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, তোমাদের এখানে এ পদার্থটী পাওয়া যায় নাকি ?

শিষ্য। প্রচুর পাওয়া যায়।

গুরু। তোমরা ইহাকেই ইলিশ মাছ বল ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা ; আশ্চর্য্য কিছুই নয়।

শিষ্য। কেন গুরুদেব, আপনাদের দেশে কি ইহার অন্য নাম ?

গুরু। আমরা ইহাকে বলি, মৎস্যরাজ ইল্লীশেশ। আচ্ছা, তোমাদের এখানে ইহা কোথায় জন্মে বল দেখি ?

শিষ্য। আজ্ঞে, ইহা পদ্মানদীতে পাওয়া যায়।

গুরু। ও, পদ্মা গঙ্গারই শাখা বটে, সেই জন্যই তাঁহার

গর্ভে এই মৎস্যরাজ বিরাজমান। ধন্য ধীবরকুল, তাহারা পদ্মা হইতেও সন্ধান করিয়া এই গঙ্গাজাত পবিত্র মৎস্যরাজদিগকে ধরিতেছে।

শিষ্য। গুরুদেব! এ মাছ কি খুব পবিত্র?

গুরু। ছিঃ, উহাকে আর মাছ বলিও না। উহা পবিত্র মৎস্যরাজ।

শিষ্য। তবে কি ইহা আপনাদের সেবায়ও লাগে?

গুরু। তোমরা জান না, ইহা ভোজনে মুক্তি পর্য্যন্ত হয়।

শিষ্য। কৈ আমরা তো এ যাবৎ ইহার কিছুই জানিতাম না!

গুরু শিষ্যবাড়ীতে ইলীশ মাছের প্রচুর আমদানী দেখিয়া পূর্ব্বরাত্রেই একটী বচন রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি এই সময় সেই বচনটী আওড়াইয়া শিষ্যকে শুনাইলেন। সেই বচনটী এই,—

"বিশ্বাধারো হি বায়ুস্তদুপরি কমঠস্তত্র শেষস্ততো ভূঃ,
তস্যাং শৈলাধিরাজস্তদুপরি গিরিশো যস্য মূর্দ্ধ্ন্যস্তি গঙ্গা।
গঙ্গায়ামিল্লীশেশস্ত্রিভুবনবিদিতো মৎস্যরাজঃ স আস্তে,
কিং ক্রমস্তস্য ভাগ্যং যদি পরিলভতে ভোজনাদ্ যস্য মুক্তিঃ॥"

অর্থাৎ বায়ু হইলেন—বিশ্বাধার; সেই বায়ুর উপর কূর্ম্ম; তদুপরি অনন্ত; তাঁহার উপর পৃথিবী; এই পৃথিবীর উপর শৈলাধিরাজ হিমালয়; সেই হিমালয়োপরি আছেন—মহাদেব;

তাঁহার মস্তকে থাকেন—গঙ্গা ; সেই গঙ্গাগর্ভে ত্রিভুবন-বিখ্যাত মৎস্যরাজ ইল্লীশেশ বিরাজ করেন ; সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ মৎস্যরাজ প্রাপ্ত হন, তাঁহার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব ? উহা ভোজনে নিশ্চিতই মুক্তি হইয়া থাকে।

বুদ্ধিমান্ শিষ্য গুরুমুখে এই ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন ; গুরু সেই দিন হইতে শিষ্যালয়ে ইলীশ মাছ পাইতে লাগিলেন।

বিরহিণী।

বঙ্গদেশের কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্ত্তক মহারাজ বল্লাল সেনের নাম এ বাঙ্গলায় সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এই বল্লাল সেনের পুত্রের নাম লক্ষ্মণসেন। এই লক্ষ্মণসেনেরই বার্দ্ধক্যে এই বঙ্গদেশ পরাধীনতার প্রথম শৃঙ্খল পরিয়াছিল। লক্ষ্মণসেন বাল্য হইতে বিদ্যাভ্যাসের জন্য স্থানান্তরে গুরুর আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে অস্বাধ্যায় উপলক্ষে বাড়ী আসিতেন। অষ্টমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা পূর্ণিমা ও প্রতিপৎ,—এই কয়টী হইল অস্বাধ্যায় তিথি। লক্ষ্মণসেন ত্রয়োদশীতে বাড়ী আসিয়া

তিন দিন পরে দ্বিতীয়ার দিনই আবার গুরুগৃহে চলিয়া যাইতেন। বিবাহের পরও তিনি এই নিয়মে চলিতে লাগিলেন। গৃহে তাঁহার যুবতী স্ত্রী; তাঁহাকে মাসের মধ্যে প্রায় চব্বিশ দিন কাল পতিবিরহ সহ্য করিতে হইত। এই বিরহ ক্রমে তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি এক দিন একান্তে বসিয়া, এইরূপ একটী কবিতা লিখিলেন,—

"মাতস্ত্রয়োদশি তিথে প্রণমামি তুভ্যং,
মৎকান্তসঙ্গমবিধায়িনি সর্ব্বসিদ্ধিঃ।
ভূয়াস্ত্বমেব দশপঞ্চদিনানি যাবৎ,
মাভূৎ কদাচিদপি পাপতিথির্দ্বিতীয়া।"

অর্থাৎ হে মাতঃ ত্রয়োদশি তিথি! তোমায় প্রণাম করি। তুমি আমার স্বামি-সঙ্গ-বিধায়িনী, সর্ব্বসিদ্ধি-দাত্রী। আমি প্রার্থনা করি, তুমি একাই প্রতিপক্ষীয় পঞ্চদশ দিন যাবৎ অবস্থান কর। পাপতিথি দ্বিতীয়া যেন আর কখন না আসে।

ঘটনাক্রমে এই কবিতাটী মহারাজ বল্লালসেনের হাতে গিয়া পড়িল। বল্লাল সেই দিনই পুত্রকে বাটী আসিতে পত্র লিখিলেন। কিন্তু পুত্র পিতার পত্র পাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট দিনেও বাড়ী আসিলেন না। পুত্র না আসিবার কারণ পিতার প্রতি অভিমান। তাঁহার অভিমানের কারণও কিঞ্চিৎ ঘটিয়াছিল। এইরূপ একটা জনরব রটিয়াছিল যে, মহারাজ বল্লাল এক সুন্দরী 'পোদ'-নন্দিনীর প্রণয়প্রার্থী হইয়াছেন। এই জনরবে পুত্র অতিমাত্র

ব্যথিত হন। তিনি রাজধানীতে না আসিয়া পিতাকে একটী কবিতা লিখিয়া পাঠান। কবিতাটী এই ;—

"শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা,
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং ত্বং জীবিনাং জীবনম্,
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ॥"

ইহার অর্থ এই যে, হে জল! শৈত্য তোমার সহজ গুণ; স্বচ্ছতা তোমার স্বাভাবিক। তোমার পবিত্রতার কথা কি বলিব? অপর সকলে তোমারই স্পর্শে পবিত্র হইয়া থাকে। তোমার প্রশংসার কথা আর কি কহিব? তুমিই জীবনধারীদিগের জীবন। এ হেন জল, তুমি যদি নীচ পথে ধাবিত হও, তবে কে তোমাকে রোধ করিতে পারিবে?

পুত্রের কবিতার ভাব বুঝিতে বিজ্ঞ বল্লালের বিলম্ব হইল না। তিনি বুঝিলেন,—আমার সম্বন্ধে যে জনরব রটিয়াছে, পুত্র তাহাতেই বিচলিত হইয়া এই পত্র লিখিয়াছে এবং সেইজন্যই অভিমানে রাজধানী আসিতেছে না। যা' হউক, ইহার উত্তর এখনই দিতে হইবে। এই ভাবিয়া বল্লাল পুত্রকে একটী কবিতা লিখিয়া জানাইলেন। কবিতাটী এই—

"তাপো নাপগতস্তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলিস্তনোঃ,
ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা।

দূরস্থেন করেণ মত্তকরিণা স্পৃষ্টা নবা পদ্মিনী,
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ ॥”

অর্থাৎ মহারাজ বল্লাল নিজেকে এক মত্ত গজরূপে প্রতিপন্ন করিয়া পুত্রকে ভঙ্গীক্রমে নিজসম্বন্ধীয় জনরব মিথ্যা বলিয়া জানাইতেছেন। কবিতার কথা এই যে, মত্ত গজ জলে নামে নাই, তাহার তাপ যায় নাই, তৃষ্ণা কমে নাই, দেহের ধূলিও ধৌত হয় নাই এবং স্বচ্ছন্দে সে কন্দকবলও গ্রহণ করে নাই। কেলির কথা আর কি বলিব? মত্ত গজ দূরস্থ কর প্রসারিত করিয়া পদ্মিনীকে [পক্ষান্তরে ‘পোদ’কন্যাকে] স্পর্শ না করিতেই মধুপগণ [পক্ষান্তরে কতকগুলি মাতাল] অকারণে একটা ঝঙ্কার-কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে।

পুত্র পিতার নিকট হইতে এই উত্তর পাইলেন; কিন্তু এ উত্তরে তাঁহার মন প্রসন্ন হইল না। তিনি পুনরায় একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন। কবিতাটী এই;—

“পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্ধাম্নাং হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটনিহতাশেষতমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ ॥”

অর্থাৎ জনরব সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, উহা অতি বড় মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য লোপ করে। দৃষ্টান্ত—নিখিল অন্ধকার-ধ্বংসী অতি তেজস্বী রবি কন্যাগামী [কন্যারাশি-গত] হইয়া

তুলা [তুলারাশি ও তুলা প্রায়শ্চিত্ত] উত্তীর্ণ হইলেও তাঁহার আর সেরূপ তেজ থাকে না।

বল্লালসেন পুত্রকে এই পত্রেরও উত্তর দিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে আনিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনি পুত্রকে লিখিলেন,—

"সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা,
বিধাতুর্দোষোঽয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।
স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণিঃ,
ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিম্বা ন বসতি ?"

অর্থাৎ—চন্দ্রের একটুকু কলঙ্ক-কণা কোনরূপে জন্মিয়াছে। এ দোষ বিধাতার, চন্দ্রের নহে। চন্দ্র গুণের আকর; তাঁহার ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না। দেখ, তিনি কি অত্রির পুত্র নহেন ? হরচূড়ায় মণিরূপে তিনি কি বিরাজ করেন না ? তাঁহার কিরণে কি অন্ধকার ধ্বংস হয় না ? তিনি কি জগতে সর্ব্বোপরি বিরাজ করেন না ?

পিতার প্রেরিত এই কবিতা পড়িয়া পুত্র আর কোন উচ্চ বাচ্য করিলেন না। তবে ঘটনাক্রমে বাড়ী যাইতে কিছুদিন তাঁহার বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বর্ষাকাল উপস্থিত। বর্ষাগমে বিরহিণীর প্রাণ অতিষ্ঠ; বল্লালপুত্রবধূ পাগলিনীপ্রায়। তিনি অন্নপানে বীতস্পৃহ হইয়া একদিন একান্তে একখণ্ড কাগজে একটী কবিতা লিখিয়া নিজ শয্যাগৃহে শুইয়া রহিলেন।

পরিচারিকামুখে মহারাজ বল্লাল এই সংবাদ শুনিলেন এবং সেই পরিচারিকা-দ্বারাই লিখিত কাগজখণ্ড আনাইয়া পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে ;—

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি ॥"

অর্থাৎ অবিরত বারিপাত হইতেছে, শিখিকুল সহর্ষে নৃত্য করিতেছে ; অতএব আজ কান্ত বা কৃতান্ত যিনিই হউন, আমার দুঃখের অন্ত করিবেন।

মহারাজ বল্লাল পুত্রবধূ-লিখিত এই কবিতা পড়িয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি সেই রাত্রি-মধ্যেই পুত্রকে আনাইবার জন্য কতিপয় কৈবর্ত্তকে ডাকাইয়া আনিলেন। কৈবর্ত্তগণ উপস্থিত হইলে বল্লাল বলিলেন, তোমরা অদ্য রাত্রিমধ্যেই আমার পুত্রকে যদি আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগকে তোমাদের প্রার্থনানুরূপ পুরস্কার প্রদান করিব। কৈবর্ত্তগণ সম্মত হইয়া অসাধ্য সাধনে প্রস্তুত হইল।

মহারাজ বল্লাল তাহাদের হস্তে একটী কবিতা লিখিয়া দিলেন। কৈবর্ত্তগণ নৌকাযোগে ক্ষিপ্রগমনে গিয়া অতি দূরস্থ রাজপুত্রের পাঠস্থানে উপনীত হইল এবং রাজপুত্রের হাতে সেই কবিতাটী প্রদান করিল। পুত্রের নিকট পিতার লিখিত সেই কবিতাটী এই ;—

"সন্তপ্তা দশমধ্বজেন শিখিনা সম্মূচ্ছি'তা নির্জ্জলে,
তুর্য্যদ্বাদশবদ্দ্বিতীয়মতিমন্নেকাদশেবস্তনী।
সা ষষ্ঠী নরপঞ্চমস্য নবম-ভ্রূঃ সপ্তমীবর্জিতা,
প্রাপ্নোত্যষ্টমবেদনাং প্রথম হে তূর্ণং তৃতীয়ো ভব॥"

অর্থাৎ হে মূঢ়মতে! অতুলনীয়া নরসিংহরাজনন্দিনী এখন পূর্ণ যুবতী; তাঁহার ভ্রূ দুইটী ধনুর ন্যায়, স্তনযুগ্ম কুম্ভের ন্যায়; তিনি কামানলে সন্তপ্তা হইয়া নির্জ্জল প্রদেশস্থ মীন ও কুলীরকবৎ মূৰ্চ্ছিতা হইয়া আছেন। তাঁহার বেদনা বৃশ্চিকদংশনবৎ অনুভূত হইতেছে। অতএব হে প্রথম, অর্থাৎ হে মেষ! তুমি সত্বর আসিয়া তৃতীয় অর্থাৎ মিথুন হও।

রাজপুত্র কবিতাটী পড়িয়া আর বিলম্ব করিলেন না। তৎক্ষণাৎ নৌকারোহণ করিয়া রাত্রিশেষে রাজভবনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

পুত্রাগমনে মহারাজ মহা সন্তুষ্ট হইলেন। পরদিন কৈবর্ত্তগণ পুরস্কার লইতে আসিল। বল্লাল তাহাদিগকে যথেচ্ছ পুরস্কার লইতে বলিলেন। তখন তাহারা তাহাদের দলপতির নিকট গিয়া বলিল,—মহারাজের নিকট হইতে আমরা কি পুরস্কার চাহিয়া লইব, বলিয়া দাও। দলপতি বলিয়া দিল, তোমরা এই সুযোগ ছাড়িও না। এক ঘটী জল লইয়া গিয়া মহারাজকে তোমরা বল যে, আমরা আর কিছুই চাহি না, আপনি আমাদের আনীত এই জলদ্বারা পাদ প্রক্ষালন করুন, ইহাই আমাদের পুরস্কার।

কৈবর্ত্তগণ তাহাই করিল। মহারাজ বল্লাল তাহাদের অভিপ্রায়-মত কার্য্য করিলেন।

কথিত আছে, সেই হইতেই এক শ্রেণীর কৈবর্ত্ত জল-আচরণীয় জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

'হাত-চালান'।

পূর্ব্বে এদেশে কোন নষ্ট, অপহৃত বা অজ্ঞেয় বস্তুর উদ্ধার বা নির্ণয়ের জন্য বিবিধ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে 'হাত চালান' নামে একটী প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। তন্ত্রমন্ত্রবিধিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। এই প্রক্রিয়া এখনও এ দেশে ক্বচিৎ কোথাও কোথাও অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

কথিত আছে, একবার মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর নগরে খুব ধূমধামের সহিত এই 'হাত চালান' ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

যশোরে মা যশোরেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজের ব্যয়ে প্রত্যহ তাঁহার পূজানুষ্ঠান বিশেষরূপে সমাহিত হইত। মহারাজ নিজে একজন আনুষ্ঠানিক হিন্দু ও দেবী-ভক্ত শাক্ত ছিলেন। যশোরেশ্বরী তাঁহার কুলদেবতা বা কুললক্ষ্মীরূপেই

অর্চ্চিতা হইতেন। অনেক ভক্ত সাধক, সাধু সন্ন্যাসী যশোরে মা যশোরেশ্বরীর দর্শন-লালসায় গমন করিতেন। প্রবাদ এই যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই যশোরেশ্বরী দেবীর প্রসাদেই সাধারণ জায়গীরদার হইতে বাঙ্গলার দ্বাদশভৌমিক রাজা পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। মা যশোরেশ্বরীর প্রসাদেই তিনি যুদ্ধে কোথাও পরাজিত হইতেন না।

কুক্ষণে দিল্লীর বাদসাহের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল। বাদসাহ তাঁহার প্রধান সেনাপতি মানসিংহকে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া প্রতাপাদিত্যও প্রস্তুত হইলেন। মহাসমারোহে মা যশোরেশ্বরীর অর্চ্চনা হইল। মায়ের অর্চ্চনান্তে মহারাজ প্রবল বাঙ্গালী সৈন্যদল লইয়া বিপুল বিক্রমে গঙ্গাতীরে বাদসাহী সৈন্য আক্রমণ করিলেন। প্রথম আক্রমণে বাদসাহী সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গঙ্গার পরপারে ছুটিয়া গেল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শিবির আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইল।

পরদিন ভোরে এক মেথরাণী যথানিয়মে রাজকীয় শিবির-সংলগ্ন অপরিস্কৃত স্থান পরিষ্কার করিতে আসিল। ঘটনাক্রমে মহারাজও এই সময়ই নিদ্রাভঙ্গের পর কেবল মাত্র ‘দুর্গা’ ‘দুর্গা’ বলিয়া বাহির হইলেন। বাহির হইবামাত্র তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে সেই মেথরাণীর উপর পড়িল; মেথরাণীর হস্তে সম্মার্জ্জনী এবং বক্ষ কক্ষ সকলই অনাবৃত। এই অর্দ্ধনগ্ন স্ত্রীলোকদর্শনে

মহারাজ 'অযাত্রা' মনে করিয়া অন্তরে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম হইল—মেথরাণীর স্তনদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলো।

মহারাজের হুকুম তৎক্ষণাৎ তামিল হইল। এই ভীষণ ঘটনা যে দিন ঘটিল, সেই দিনই মা যশোরেশ্বরী বিমুখ হইলেন। যশোর হইতে পরদিনই খবর আসিল,—মা যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তি পরাঙ্মুখী হইয়াছেন। প্রতাপাদিত্য বুঝিলেন,—আর জয়ের আশা নাই।

এদিকে মায়ের মূর্ত্তি পশ্চান্মুখী দেখিয়া যশোরনগরবাসী সকলেই বিপদ আশঙ্কায় আকুল হইলেন। বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধু সজ্জন সকলেই ইহার কারণ-নির্ণয়ের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্থির হইল—মা কেন বিমুখ হইলেন, 'হাত চালান' দ্বারা নির্ণয় করা হউক।

যথাকালে একজন শুদ্ধ পাত্রে যোগ্য বিধিজ্ঞ লোকের সাহায্যে মায়ের মন্দিরের সমক্ষেই 'হাত-চালানে'র ব্যবস্থা হইল। বহু লোক 'হাতচালান' দেখিতে আসিলেন। 'হাতচালানে' কি হয়, কি লেখা হয়, ইহা জানিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত। অনেকক্ষণ ধরিয়া হস্তোপরি মন্ত্রজপের পর হাত চলিয়া উঠিল। অঙ্গুলি কুঞ্চিত হইয়া লিখিতে লাগিল। লেখা শেষ হইলে হস্ত স্থির হইল। সকলেই পড়িয়া দেখিলেন, সেই স্থানে একটী শ্লোক লেখা হইয়াছে। শ্লোকটী এই ;—

"শুম্ভঃ সুরেন্দ্রবিজয়ী নিহতো নিশুম্ভঃ,
তদ্বত্রিলোকবিজয়ী মহিষাসুরোঽপি।
সাহং সুরাসুরনমস্কৃতপাদপদ্মা,
কীটোপমেন মনুজেন কৃতাবমানা॥

ইহার অর্থ এই যে,—সুরেন্দ্রবিজয়ী শুম্ভ এবং নিশুম্ভকে আমি নিহত করিয়াছি। ঐরূপ ত্রিলোকবিজয়ী মহিষাসুরও আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই আমি—সেই সুরাসুর কর্ত্তৃক বন্দিত-চরণা আমি, আজ কি না একটা কীটোপম মনুষ্য-কর্ত্তৃক অবমানিতা হইলাম!

শ্লোক পড়িয়া সকলেই অবাক্। মায়ের নিকট কে কিসের জন্য অপরাধী, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। সকলেই উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যে মহারাজ-সৈন্যের পরাজয়বার্ত্তা যশোরনগরে আসিয়া পৌঁছিল। রাজা যশোরে হটিয়া আসিলেন; 'হাতচালানে'র কথা শুনিলেন; বলিলেন,—আমারই অপরাধে মা বিমুখ হইয়াছেন। আর রক্ষা নাই। ফলে তাহাই হইল। সেনাপতি মানসিংহের হস্তে বন্দী হইয়া মহারাজ দিল্লীনগরে নীত হইলেন।

যোগ্য ছাত্র।

এক স্থানে অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের এক সভা হইয়াছে। বহু পণ্ডিত আসিয়া বসিয়াছেন। সভাগৃহে স্থান সঙ্কুলন হইতেছে না। এমন সময় এক অধ্যাপক ছাত্র সহ সভাগৃহে আসিয়া উপস্থিত; কিন্তু বসিবার স্থান তেমন সুবিধামত নাই, দেখিয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন,—'স্থানো নাস্তি' তাঁহার এই কথায় পণ্ডিতবর্গ হাসিয়া উঠিলেন। হাসিবার কারণ, আগন্তুক অধ্যাপক অশুদ্ধ বলিয়াছেন। কেন না, স্থান শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; তিনি তাহা পুংলিঙ্গে প্রয়োগ করিয়াছেন।

সকলের হাস্য দেখিয়া আগন্তুক অধ্যাপক একটু অপ্রতিভ হইলেন। অধ্যাপকের সঙ্গী ছাত্র গুরুকে এরূপ অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া বলিলেন,—আপনারা 'স্থানো নাস্তি' বলায় হাসিয়া উঠিলেন কেন? অধ্যাপক ত' ঠিকই বলিয়াছেন; 'স্থানো নাস্তি' ইহার ব্যাখ্যা—"নঃ অস্মাকং স্থা স্থিতিঃ স্থানমিতি যাবৎ নাস্তি ন বিদ্যতে।" ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই ঐ বাক্যের শুদ্ধতা স্বীকার করিলেন। ছাত্রও বেশ প্রশংসা পাইল।

কবিরাজ ও মহামহোপাধ্যায়।

কোন নগরে এক কবিরাজ ছিলেন। কবিরাজের পড়াশুনা বিশেষ ছিল না। কোন সুচিকিৎসকের সঙ্গে থাকিয়াও তিনি চিকিৎসাপ্রণালী শিখেন নাই; অথচ তিনি কবিরাজ। তাঁহার কবিরাজ হওয়ার পক্ষে প্রবল দাবী এই যে, সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞান তাঁহার ছিল, আর চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, চক্রদত্ত প্রভৃতি কবিরাজী গ্রন্থগুলির নাম তিনি জানিতেন এবং দুই একটা বচনও তাঁহার মুখস্থ ছিল। কবিরাজ মহাশয় মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন লোকের সামনে কখন কখন তাহার এক আধটা বচনও ঝাড়িয়া বসিতেন। বিদ্যা তাঁহার এই। তারপর হাত যশ, সে সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি রোগী দেখিতে গেলে সে রোগী প্রায় বাঁচিত না। লোকে তাঁহাকে 'ব্যাধিসিন্ধু' বলিয়া ডাকিত। লোকে যেরূপ ভাবিয়াই তাঁহাকে ঐ নামে ডাকুক, তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি এতই ছিল যে, তাঁহাকে ঐ নাম ধরিয়া ডাকিলে তিনি বরং গর্ব্বানুভবই করিতেন, আর মধ্যে মধ্যে লোককে বুঝাইতেন,—আমাকে লোকে 'ব্যাধিসিন্ধু' বলে কেন, জান? আমার হাতে নানা রোগ আরোগ্য হয় বলিয়াই নামটা আমার 'ব্যাধিসিন্ধু'।

এই ব্যাধিসিন্ধু কবিরাজ মহাশয়ের এক বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম বিশ্বভণ্ড। ইনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পাইয়াছিলেন। এত বড় উপাধি সত্ত্বেও তাঁহাকে যাজকতা করিতে হইত। একবার বিশ্বভণ্ড মহাশয়কে কোন সভায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন রসিক পণ্ডিত তাঁহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন; যথা—

"দিনোপবাসী তু নিশামিষাশী জটাধরঃ সন্ কুলটাভিলাষী।
অয়ং কষায়াম্বরচারুদণ্ডঃ সমাগতঃ সম্প্রতি বিশ্বভণ্ডঃ।"

অর্থাৎ সম্প্রতি বিশ্বভণ্ড মহাশয় আসিতেছেন; ইহার পরিধানে গৈরিক বসন, হাতে একগাছি সুন্দর ছড়ি। ইনি দিনে উপবাসী; কিন্তু রাত্রে আমিষাশী; আর মস্তকে জটাধারী হইয়াও কুলটাজনের অভিলাষী।

এ হেন মহামহোপাধ্যায় মহাশয় একদা ভিন্ন গ্রাম হইতে নগরে প্রবেশ করিতেছেন। এই সময় তাঁহার বন্ধু কবিরাজ ব্যাধিসিন্ধু মহাশয়ও আসিয়া জুটিলেন। উভয় বন্ধু মিলিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন, ইতিমধ্যে নগরপ্রান্তে চিতাধূম দেখা গেল। কবিরাজ বিস্মিত হইয়া তাঁহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসিলেন,—ভায়া হে, ব্যাপার কি?

"ত্বয়া ন পঠিতা চণ্ডী ময়া নাপি চিকিৎসিতম্।
অকস্মান্নগরপ্রান্তে কথং ধূমায়তে চিতা।"

অর্থাৎ হাঁ হে বন্ধু, তুমিও চণ্ডী পড় নাই, আমিও চিকিৎসা করি নাই। হঠাৎ নগরপ্রান্তে চিতাধূম উঠিতেছে কেন হে?

বন্ধু মহামহোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন—তুমি কি মনে কর যে, কেবল তুমি-আমিই দেশে চিকিৎসক, আর অধ্যাপক। তোমার আমার ন্যায় চিকিৎসক-অধ্যাপকে দেশ যে এখন ভরপূর!

কৃপণের কথা।

তুলসীরাম বাবুর শ্রাদ্ধ। নানাদেশ হইতে অধ্যাপক পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। তুলসীরাম বাবুর দুই পুত্র কর্ম্ম-কর্ত্তা। তাঁহারা নিজেরাই দেখিয়া শুনিয়া সকল কাজ নির্ব্বাহ করিতেছেন। শ্রাদ্ধে ব্যয় তাঁহাদের খুবই হইল। কিন্তু কর্ম্ম-কর্ত্তা দুইটী-ভাইই অতি দৃষ্টিকৃপণ বলিয়া কাজে তেমন সুযশ হইল না। শ্রাদ্ধের দিন তাঁহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে যে 'সিধা' দিলেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃপণতারই পরিচয় প্রকাশ পাইল। 'সিধা'র অন্যান্য দ্রব্যের কথা নাই বলিলাম, তাহাতে যে তারকারী দেওয়া হইয়াছিল, তাহারই কথা বলি। এক একটী 'সিধা'র তরকারীর মধ্যে ছিল এক একটী বেগুন। সে বেগুন আবার

যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি কীট-দষ্ট। একজন অধ্যাপকের ছাত্র রান্না করিতেছেন; ডাল রাঁধিলেন, ভাত রাঁধিলেন, বেগুনটী ভাজিয়া লইবেন, ভাবিলেন; পারিলেন না। কেন না, তৈল যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা গায় মাখিতে এবং ডাল রাঁধিতেই ফুরাইয়া গিয়াছে। অগত্যা বেগুনটী পোড়াইয়া লওয়া স্থির হইল। ছাত্র বেগুনটী উনানের মধ্যে ফেলিলেন; কিন্তু কোন গতিকেই আর তুলিতে পারিলেন না। তখন তিনি সাক্ষেপে বলিলেন,—

"কীটাকুলিতবার্ত্তাকী ক্ষুদ্রাখুবৃষণোপমা।
পঞ্চাননাদ্ বিনিষ্ক্রান্তা ন নিষ্ক্রান্তা হুতাশনাৎ॥"

অর্থাৎ তরকারীর মধ্যে একটী মাত্র বেগুন, তাও কীটাকুলিত, আকারে তাহা ক্ষুদ্র ইন্দুরের বৃষণতুল্য। এ হেন বেগুন যদি বা পঞ্চানন (কৃতীর নাম) হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইল; কিন্তু অগ্নি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না।

অধ্যাপক স্নানাহ্নিক করিতে গিয়াছিলেন; আসিয়া সকল কথা শুনিলেন; শুনিয়া বলিলেন,—

"তুলসীরামস্য দ্বৌ পুত্রৌ দ্বাবেব কৃপণোত্তমৌ।
জ্যেষ্ঠস্যাত্মমাতধর্ম্মে কনিষ্ঠো 'গু-খেকোর' বেটা।"

অর্থাৎ তুলসীরামের দুইটা পুত্রই কৃপণের চূড়ান্ত। তবে জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মে কতকটা মতি আছে। কিন্তু কনিষ্ঠ একেবারেই গু'খেকোর বেটা। কবিতা শুনিয়া সকলেরই অট্টহাস্য।

আর একটী 'হাতচালান'।

একবার কয়েকজন পণ্ডিত লোক একত্র হইয়া একখানি সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থ দেখিতেছিলেন। এই গ্রন্থখানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত। বিজ্ঞ লেখকের লেখা তাই ভ্রম-প্রমাদ কিছুই ছিল না। কিন্তু পণ্ডিতগণ পাঠ করিতে করিতে অনেকস্থানে সন্দিহান হইতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—কোথাও আত্মনেপদী ধাতুর পরস্মৈপদে প্রয়োগ রহিয়াছে, কোথাও প্রসিদ্ধ পুংলিঙ্গ শব্দ ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং কোথাও বা সন্ধি-অনুসারে অকার লুপ্ত হইবার প্রসক্তি সত্ত্বেও অলুপ্ত রহিয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া পণ্ডিতগণ কালী-কলম লইয়া নিজেরা পুঁথিখানি সংশোধন করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে পুস্তকখানির অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহারা সংশোধন করিলেন; কিন্তু পুঁথিখানির যিনি মালিক, তিনি সংশোধকদিগের ন্যায় পণ্ডিত নহেন; কিন্তু প্রাচীনত্বের একান্ত গোঁড়া। তিনি পণ্ডিতদিগের ঐরূপ সংশোধন-ব্যাপারে গোড়া হইতেই আপত্তি জানাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার কথা এই,—বিজ্ঞজনলিখিত প্রাচীন পুঁথি কাটিও না। ঐ সকল নিশ্চয়ই আর্ষ প্রয়োগ। পণ্ডিতগণ বলিলেন; যে সকল পদ প্রচলিত ব্যাকরণ-অনুসারে সুসাধিত হইয়া প্রযুক্ত হইলেও ছন্দ বা অর্থভঙ্গ হয় না, সে সকল পদের

আর্ষত্ব স্বীকার করিতে যাই কেন ? বিশেষতঃ পাণিনিও একজন ঋষি, তাঁহার কৃত ব্যাকরণ মতে যে শুদ্ধ পদ, তাহাও ত' আর্ষ-প্রয়োগ। কিন্তু আপত্তিকারীর মন কিছুতেই শুদ্ধ হইল না। তিনি ঐরূপ পদশোধন-ব্যাপারে ঘোর আপত্তি জানাইয়া বাধা দিতে লাগিলেন। তখন পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন, আচ্ছা এ ব্যাপারটী দৈবের উপর নির্ভর করা যাউক। 'হাত চালান' দেওয়া হউক। দেখি তাহাতে কি লেখা হয়। আমরাই ঠিক করিতেছি, কি ভুল করিতেছি, তাহা ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

সঙ্কল্প-অনুসারে কার্য্যারম্ভ হইল। এই ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কোন একজন লোকের হাতে যথাবিধি মন্ত্র জপ হইতে লাগিল। মন্ত্র-প্রভাবে কিছুক্ষণ পরেই হাত চলিয়া উঠিল। ক্রমে তর্জ্জনী কুঞ্চিত হইয়া মৃত্তিকায় লিখিতে লাগিল। নানা অবোধ্য বিষয় লিখিতে লিখিতে সর্ব্বশেষে এই কবিতাটী লিখিত হইল :—

"যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে।"

অর্থাৎ মাহেশ নামক প্রাচীন ব্যাকরণ রত্নাকরতুল্য; সেই রত্নাকর হইতে মহর্ষি ব্যাস যে সকল পদরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কি গোষ্পদতুল্য পাণিনি ব্যাকরণে আছে ?

এই শ্লোক পড়িয়া পণ্ডিতগণ বুঝিলেন,—পাণিনি ব্যাকরণই

সর্ব্বপ্রাচীনত্বের গৌরবভাজন নহে। মাহেশ নামে ইহা অপেক্ষাও প্রবীণ ব্যাকরণ ছিল। যাহা হউক, আমরা যে পাণিনির মতে অশুদ্ধ-শোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে কাজ আমাদের সঙ্গত হয় নাই।

অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা

গোস্বামী মহাশয় অনেক দিন পরে শিষ্যবাড়ী গিয়াছেন। বড় বড় বাবাজী আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন। ভক্ত শিষ্য-গণের অন্তরে বহুদিন হইতে যে সকল সন্দেহ-সংশয় ছিল, গুরুর কাছে জিজ্ঞাসা-বাদে একে একে তাহা মীমাংসা হইয়া যাইতেছে। আনন্দ আর ধরে না। এক একটা তত্ত্ব মীমাংসা হইয়া যায়, আর বাবাজীবৃন্দ "আহা' 'আহা' বলিয়া অবিরল আনন্দাশ্রু ফেলিয়া গল-লম্বিত হরিনামের ঝুলী প্লাবিত করেন। গোস্বামী গুরু অভ্রান্ত; শিষ্যদিগের মুখ হইতে যেমন যেমন প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, তিনি কখন একটু ভাবিয়া, কখন বা সদ্য সদ্যই তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। এই গুরু-শিষ্য-সংবাদে কিরূপ প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল, তাহার একটা নমুনা এইখানে দিতেছি।

এক বৃদ্ধ ভক্ত বাবাজী, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু হে,

"নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপান-শালিনে বনমালিনে।"

এই বচনটীর অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই, দয়াল প্রভু, আমায় বুঝাইয়া দিন।

ভক্ত গুরু ভক্ত-শিষ্যের প্রশ্ন শুনিয়াই শিষ্যকে ধন্য ধন্য করিলেন, কিছুক্ষণ চক্ষু বুঝিয়া রহিলেন। শেষে অন্তরে কি এক মহাভাব উপলব্ধি করিয়া বলিলেন,—আহা হা, বৈষ্ণব দাস! তুই না হ'লে কি এমন প্রশ্ন কেউ করে রে? ভক্ত না হইলে কি এ গুপ্ত তত্ত্ব শুনিতে আর কারো সাধ হয় রে?

শিষ্য গদ্‌গদ হইয়া যুক্তকরে অবস্থিত।

গুরু বলিলেন,—শোন ভক্তদাস, তুমি যা' জিজ্ঞাসিলে, সে বড় গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব। যা হউক, তোমায় বলিতেছি; এই ধর— "নমো নলিননেত্রায়' এটা তো অতি সোজা কথা, এটার ব্যাখ্যার কোন দরকার নাই। বিশেষতঃ এটার অর্থ যে জানে না, সে তো বৈষ্ণবই নয়। তবে কিনা তার পরের যে কথাগুলা, তাই হচ্ছে শক্ত। সে কথাটা কি না—"বেণুবাদ্যবিনোদিনে"। আহা বৈষ্ণবদাস! এ গুপ্ত কথা কেউ জানে না রে? শোন তবে— শ্রীমতী রাধা যেমন প্রভুর প্রিয়া ছিলেন, এইরূপ তাঁহার আরও একটী প্রিয়া ছিলেন, তাঁহার নামটী ছিল বিনোদী। প্রভু তাঁহার পরম প্রিয় বেণু বাদ্যটী ধরিয়া শ্রীমতী বিনোদীকে বলিলেন, বিনোদি, নে। বিনোদী হাত পাতিয়া লইলেন। তারপর

হইল—'রাধাধর-সুধাপানশালিনে বনমালিনে'। অর্থাৎ প্রভু তারপর শ্রীমতী রাধাকে বলিলেন,—'রাধা, তুমি শুধু পান ধর।' শ্রীমতী শুধু পান লইবেন কেন? তিনি বেজায় মান করিয়া বসিলেন। তখন প্রভু রাগিয়া বলিলেন,—'শালি, নে।' শালি বলায় শ্রীমতীর রাগ হইল। শ্রীমতী বলিলেন,—'বনমালি নে।' ইহাই হইল নিগূঢ় অর্থ।

গুরুর মুখে এই ব্যাখ্যা শুনিয়া বাবাজীদল কাঁদিয়া ঢলঢল!

তর্পণ।

বিলাত-ফেরৎ বাবুর দল হিন্দুসমাজে চলিতে পারে কি না, এই প্রশ্ন লইয়া কলিকাতায় যখন প্রথম আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত বিলাত-ফেরতের পক্ষে বড় কেউ দাঁড়াইলেন না। সামাজিক জন-সাধারণ ঐরূপ প্রস্তাবের একান্তই বিরোধী হইয়া উঠিলেন। অনেকে বিলাত-প্রত্যাগত নিজ পুত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মত্যাগী পুত্র নিজ বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিতে না পারে, এজন্য 'উইল' পর্য্যন্ত করিয়া যাইতে লাগিলেন। এদিকে বিলাত-ফেরৎ বাবুর দলও সমাজে চলিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে

লাগিলেন। তাঁহারা কাহাকে অর্থ দিয়া, কাহাকে বিনয়-সৌজন্যে আপ্যায়িত করিয়া স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এত করিয়াও কলিকাতায় তখন যে সকল খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে রাজী করাইতে পারিলেন না। অবশেষে মফঃস্বলে চেষ্টা চলিল। অনেক চেষ্টায় মফঃস্বলের কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিলাত-ফেরৎদিগকে সমাজে চালাইবার পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। কথা হইল, কলিকাতার একটা সভা হইয়া শাস্ত্রীয় বিচার হইবে। গঙ্গার উভয়-তীরস্থ কয়েকটী স্থানের কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিলাত-ফেরতের পক্ষ লইয়া বিচার করিবেন। কলিকাতায় একজন গণ্যমান্য ধনী কায়স্থ-ভবনে সভাধিবেশনের আয়োজন চলিল। নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সভায় আসিবার উদ্যোগ করিলেন।

যে দিন সভাধিবেশন হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন গঙ্গার ঘাট লোকে লোকারণ্য। কারণ কি, কেন এত লোক সমাগম? লোক-সমাগমের কারণ এই যে, যে কয়টী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিলাত-ফেরতের পক্ষ লইয়া বিচার করিবেন, তাঁহারা ষ্টীমারে আসিতেছিলেন। তাঁহাদের অবতরণ-কালে এই সকল লোক তাঁহাদিগকে দেখিবে, চিনিয়া রাখিবে। যাহা হউক, যথাকালে ষ্টীমার আসিল। যে কয়টী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিলাতযাত্রার সমর্থনের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে আহিরীটোলার ঘাটে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় আর এক নূতন দৃশ্যে দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি পড়িল। সকলে দেখিলেন,—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য-সমাজের কতকগুলি ভদ্রলোক বড় বড় ধামা লইয়া গঙ্গার ঘাটে নামিলেন এবং এক এক ধামা গঙ্গাজল তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে তর্পণ আরম্ভ করিলেন। কেহ বলেন, 'অমুকগোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব', কেহ বলেন, 'অমুকগোত্রং পিতরং তর্পয়ামি', কেহ বলেন, 'অমুকগোত্রঃ পিতা তৃপ্যতাং' এইরূপে যাঁর যেমন মন্ত্রাধিকার, তিনি সেইরূপ মন্ত্রে তর্পণ করিতে লাগিলেন। সকলে অবাক্! তীরে দর্শকমণ্ডলী,—আর ষ্টীমারের সিঁড়ি বাহিয়া অবতরণোন্মুখ পণ্ডিতমণ্ডলী,—সকলেই কুতূহলী। একি কাণ্ড! অসময়ে এরূপ দল বাঁধিয়া তর্পণ কেন? নবাগত পণ্ডিতগণ এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় ও কৌতূহলভরে সত্বর সিঁড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া তর্পণকারী ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসিলেন,—আপনারা এ অসময়ে এ কি করিতেছেন? আমরা তো কিছুই বুঝিতেছি না। তখন একজন উত্তর করিলেন,—আপনাদের আগমন জন্যই আমাদের এই তর্পণ। আগন্তুক ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা বলিলেন, সে কি কথা! ভদ্রলোক উত্তর দিলেন,—আজ্ঞে আপনারাই না বিলাত-ফেরৎ চালাইবার ব্যবস্থা দিতে আসিতেছেন? উত্তর হইল,—হাঁ'। ভদ্রলোক বলিলেন,—তা হইলেই বুঝুন, বিলাত-ফেরৎ ব্যক্তি সমাজে চলিলে আমাদের ধর্ম্মলোপ হইবে। ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে আমাদের পিতৃপুরুষেরাও আমাদের হাতে আর জলপিণ্ড

পাইবেন না ; সুতরাং আপনারা পাঁতিটা দিবার পূর্ব্বেই আমরা বেশী বেশী জল দিয়া একবার পিতৃপুরুষের তর্পণ করিয়া লই। কোশার অল্প জল ; তাই ধামা ধরিয়াছি। এই কথা শুনিয়া তীরস্থ জনতা উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

আগন্তুক পণ্ডিতেরা ভিড়ের ভিতর গা ঢাকিয়া পলাইলেন। তাহারা পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিতে করিতে চলিলেন যে, বিলাতফেরৎ চালাইবার সময় এখনও আসে নাই।

শাক্ত ও বৈষ্ণব।

এক সভায় বসিয়া দুইজন লোক পরস্পর আলাপ করিতেছে। ইহাদের একজন শাক্ত ; অন্যজন বৈষ্ণব। বলা বাহুল্য শাক্ত কিম্বা বৈষ্ণব বলিলে যে উচ্চভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, ইহারা সেরূপ শাক্ত বা সেরূপ বৈষ্ণব নহে। ইহারা নামে মাত্র শাক্ত ও বৈষ্ণব। তবে এ দুই জনের মধ্যে শাক্ত কিঞ্চিৎ বেশী চালাক। ইহাদের আলাপে আলাপে ক্রমে ধর্ম্মের কথা উঠিল। শাক্ত বলিলেন, ভাই বৈষ্ণব ! তুমি আর যাহাই বল, তোমাদের কীর্ত্তন অপেক্ষা আমাদের শক্তিবিষয়ক গানগুলি গভীর ভাবপূর্ণ এবং ভক্ত সাধকবৃন্দের পরম উপাদেয়। শক্তি-

সাধক নির্জ্জনে আবেগভরে গান ধরিলে, বুঝি দেবতার আসনও টলে। আর তোমাদের ভাক্ত কীর্ত্তন! সে আর বলিব কি? কীর্ত্তনের কোলাহলে আর শ্রীখোলের রোলে কাণ ঝালাপালা; গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ, আর দেবতাও বুঝি 'পালাই পালাই' রবে অস্থির।

বৈষ্ণব বলিল, আরে অবোধ, তা হবে কেন? দেবতা কীর্ত্তনেই তুষ্ট। এই শোন্ তবে শাস্ত্র। শ্রীভগবান্ শ্রীনারদকে বলিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

অর্থাৎ আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগিহৃদয়ে থাকি না; আমার ভক্তগণ যেখানে গান করে, হে নারদ! আমি সেইখানেই থাকি। সুতরাং আমাদের কীর্ত্তনেই দেবতার তুষ্টি। তোরা মদ্ খাইয়া যা ইচ্ছা গান করিস্, তাতে কি আর দেবতার প্রীতি হয়? শাক্ত সাক্ষেপে বলিলেন, ওরে মূর্খ! তুই শাস্ত্রবচনের অর্থই বুঝিস্ নাই, তোকে আর আমি কি বলিব? ওরে, ভগবান্ তো ঠিকই বলিয়াছেন,—'মদ্‌ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি' অর্থাৎ 'মদ্‌ভক্তা' কিনা— মদের ভক্ত মাতালেরা, 'যত্র গায়ন্তি' যেখানে গান করে, 'তত্র তিষ্ঠামি' অর্থাৎ সেইখানেই আমি থাকি। শাক্তের এই মনগড়া উদ্ভট ব্যাখ্যায় সভা হইতে উচ্চ হাস্য উঠিল। তখন বৈষ্ণব রাগিয়া বলিলেন, যা' যা'; তোদের মদে মাংসেই রুচি, তোদের

আবার কথা ! শাক্ত বলিলেন, হাঁ আমরা ছাগমাংস খাই বটে, কিন্তু তোরা যে ভাই ছাগের নাড়ীভুঁড়ি পাইয়াই তুষ্ট ; বৈষ্ণব আরও রাগিয়া গেলেন ; বলিলেন,—কি, আমরা ছাগের নাড়ী-ভুঁড়ি খাই ? শাক্ত বলিলেন, তোদের ভাগ্যে নাড়ীভুঁড়ি কি না একবার ছ্যাখ্। যখন ছাগপশু উৎসর্গ করা হয়, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অনেক দেবতারই অর্চ্চনা হইয়া থাকে। সে সময় বলা হয় কি না,—'উদরে বৈষ্ণবৈ্য নমঃ' তাহা হইলেই বুঝিয়া ছ্যাখ্, তোদের ভাগ্যে নাড়ীভুঁড়ি কি না ?

বৈষ্ণব এবার বিষম চটিয়া গিয়া সভা ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আচ্ছা, তোকে অন্যসময় দেখিয়া লইব।

এই ঘটনার পর অনেক দিন গেল। বৈষ্ণব ভাল লোকের মত ঝগড়া ভুলিয়া নিজের নানা কাজে লিপ্ত রহিল। কিন্তু শাক্ত লোকটার স্বভাব কিঞ্চিৎ ঝগড়াটে। বৈষ্ণবের সঙ্গে একটা কিছু ঝগড়া না বাধাইতে পারিলে তার যেন আর নিদ্রা নাই। শাক্তের বাড়ী হইতে বৈষ্ণবের বাড়ী বেশী দূর নহে। একদিন একটা ঝগড়া বাধাইবার মতলব করিয়াই শাক্ত বৈষ্ণবের বাড়ী গেল। বৈষ্ণব বাড়ীতে ছিল না। শাক্ত বৈষ্ণবের তুলসীমঞ্চের নিকটে গিয়া সেখানে যত তুলসী গাছ ছিল, সব উপড়াইয়া ফেলিল এবং তুলসীর আগা পাতা সমস্ত ছিঁড়িয়া গায়ে ঘসিয়া মাখিয়া ত্বরাত্বরি বাড়ী চলিয়া আসিল। বৈষ্ণব বাড়ীতে আসিয়া

বৈষ্ণবীর মুখে তাঁহার তুলসীমঞ্চের—তুলসীবনের দুর্দ্দশার কথা আনুপূর্ব্বিক শুনিল ; শুনিয়াই বুঝিল, ইহা সেই দুষ্ট শাক্ত লোকটার কাজ ! বৈষ্ণব সঙ্কল্প করিল, আমিও উহার উপাসনা-স্থানের এইরূপ দুর্দ্দশা করিব ।

এইরূপ স্থির করিয়া বৈষ্ণব সেই দিনই শাক্তের বাড়ী গেলেন । শাক্ত যেখানে বিল্বতরু-মূলে বেদীর উপর কয়েকটী ছোট ছোট তরু-লতাগুল্ম রোপণ করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ফুল জল ছড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, বৈষ্ণব তাহার নিকটে গিয়াই সেই তরুগুলি ত্বরাত্বরি উৎপাটন করিলেন এবং শাক্ত যেভাবে তাঁহার তুলসী গাছগুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া গায়ে মাথায় মর্দ্দিত করিয়াছিলেন, তিনিও ফুলজল সহ সেই সকল গাছের আগাপাতা ছিঁড়িয়া-ছিঁড়িয়া গায় মাথায় ঘসিয়া মাখিয়া চলিয়া আসিলেন ।

কি সর্ব্বনাশ ! বাড়ীতে আসিয়াই বৈষ্ণবের সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল । স্থানে স্থানে চাকা চাকা দাগ, অসহ্য চুলকণা ! বৈষ্ণব অস্থির ; 'ত্রাহি মধুসূদন' রবে চীৎকার ।

শাক্ত সকল ঘটনাই জানিত, সে ধীরে ধীরে বৈষ্ণবের বাড়ী গিয়া বলিল,—কেমন রে বোষ্টম ভাই ! আমার পূজাস্থান আর নষ্ট ক'র্‌বি ? এই ছ্যাখ্, আমার কেমন দেবতা ! বৈষ্ণব বলিল, ভাই আমার কসুর হইয়াছে । আমায় রক্ষা কর্ ।

বলা বাহুল্য, চতুর শাক্ত বিল্বতরু-বেদীর উপর কতকগুলি

বিছুটীর গাছ ও শুকশিম্বীলতা পূর্ব্বেই লাগাইয়া রাখিয়াছিল ; তাই বৈষ্ণবের এই লাঞ্ছনা !

নূতন দরিদ্র ।

এখন যেমন বাঙ্গালার ধনী গৃহস্থ বা জমীদার-পরিবারে সরস্বতীর কৃপা ক্বচিৎ দেখা যায়, সেকালে এমনটী প্রায় ছিল না ; তখনকার ধনী, সম্পন্ন গৃহস্থ বা জমীদার যেমন কমলার কৃপা লাভ করিতেন, সেইরূপ সরস্বতীর কৃপালাভেও কৃতার্থ হইতেন। কোন বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক নিজ গৃহে আসিলে তাঁহারা সদালাপে বা উত্তর-প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে কিরূপ আপ্যায়িত করিতে পারিতেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

একদা কোন ধনী গৃহস্থ-ভবনে এক বিদেশাগত পণ্ডিত কিছু সাহায্য প্রার্থনার জন্য গিয়াছেন। ধনী ব্যক্তির বাহিরে সকল ঠাট বজায় আছে ; কিন্তু গ্রহকোপে তাঁহার পূর্ব্বসমৃদ্ধি লোপ পাইয়াছে। সুতরাং ইচ্ছামত দানাদি করা তাঁহার এখন সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। প্রার্থী ব্যক্তি ভিতরের অবস্থা জানিতেন না। তিনি লোকমুখে ধনীর নাম ও পূর্ব্বকৃত দানাদির কথা শুনিয়াই প্রার্থনার জন্য গিয়াছেন। প্রার্থী, ধনীর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই প্রার্থী ব্যক্তিও পূর্ব্বে

সমৃদ্ধ থাকিয়া ভাগ্যবৈগুণ্যে এক্ষণে দীনদশাপন্ন; তাই ধনী তাঁহাকে যখন তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসিলেন, তখন প্রার্থী প্রত্যুত্তরে একটী শ্লোকরচনা করিয়া বলিলেন,—

"নবীনদীনভাবস্থ যাচমানস্থ যাচনে।
বচোজীবতয়োরার্য্য পুরোনিঃসরণে রণঃ ॥"

অর্থ এই যে, মহাশয়! আমি নূতন দৈন্যগ্রস্ত যাচক; আমারি এই যাচ্ঞাব্যাপারে বাক্য এবং জীবন এই উভয়ের মধ্যে কে অগ্রে বহির্গত হইবে, ইহা লইয়া বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত।

ভাবার্থ এই যে, আমি আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, ইহা বলিতে যেন আমার মৃত্যুযাতনা হইতেছে।

ধনী ব্যক্তি শ্লোক শুনিবামাত্র অর্থ বুঝিলেন এবং প্রত্যুত্তরে একটু পরেই প্রার্থীর কৃত কবিতাটীই আবৃত্তি করিলেন। কেবল মাত্র 'যাচমানস্য' পদের 'চ'টি বদলাইয়া 'চ্য' করিয়া দিলেন। এইরূপ আক্ষরিক পরিবৃত্তিঘটনা ধনীর ব্যাকরণজ্ঞানেরই পরিচায়ক। ইহাতে দাঁড়াইল এই যে,—

"নবীনদীনভাবস্থ যাচ্যমানস্থ যাচনে।
বচোজীবিতয়োরার্য্য পুরোনিঃসরণে রণঃ ॥"

অর্থাৎ হে আর্য্য! নূতন দীনদশাপন্ন 'যাচ্যমান' অর্থাৎ ধনীর নিকট কেহ যাচ্ঞা করিলে তাহারই বাক্য এবং জীবন, এ উভয়ের মধ্যে কে আগে বহির্গত হইবে, ইহা লইয়া বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ফলে আমিও নূতন দরিদ্র; আমার কাছে প্রার্থী

আসায় আমি যে কিছু দিতে পারিব না, এ কথা বলিতে যেন আমার মৃত্যু-যাতনা হইতেছে।

প্রার্থী পণ্ডিত ধনীর নিকট আশানুরূপ অর্থ পাইলেন না বটে, তবে ধনী-ব্যক্তি-কৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাবে প্রীত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

সাহেবের সংস্কৃতানুরাগ।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেকলে সাহেব কলিকাতার 'সংস্কৃত কলেজ' উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার ঐ প্রস্তাব লইয়া তখন তুমুল বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। বহুদিন ধরিয়া ইহার আন্দোলন চলিতে থাকে। এই সময় সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন সাহেবকে মনের দুঃখে একটি শ্লোক লিখিয়া পাঠান। সেই শ্লোকটি এই,—

"অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে;
তেভ্যস্ত্বং যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি ॥"

অর্থাৎ এই সংস্কৃত পাঠশালারূপ সরোবরে আপনি যে সকল সুধীরূপ হংসকে স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনি দূরে

[বিলাতে] চলিয়া যাওয়ায় কালবশে তাঁহারা এখন পক্ষহীন [পাখা শূন্য ; পক্ষান্তরে পক্ষে লোক-হীন] হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের উচ্ছেদের জন্য ঐ সরসাতীরে বহু ব্যাধ শর সন্ধান করিয়া রহিয়াছে। হে পালক! আপনি যদি তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করেন, তবে আপনার কীর্ত্তি চির স্থির থাকিবে!

বলা বহুল্য, উইলসন সাহেব একজন সংস্কৃতাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতভাষার—সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন-পাঠন তাঁহার অন্তরের চিরপ্রিয় বিষয় ছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কবিতাটী তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তাহা পাঠ করিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করেন এবং মনের দুঃখে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তৎক্ষণাৎ নিম্নোক্ত চারিটী কবিতা লিখিয়া পাঠান। সেই কবিতা চারিটী এই ;—

"বিধাতা বিশ্বনির্ম্মাতা হংসাস্তৎপ্রিয়বাহনম্।
অতঃ প্রিয়তরত্বেন রক্ষিষ্যতি স এব তান্॥"

অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ; হংসজাতি তাঁহার প্রিয় বাহন। অতএব প্রিয়তর বলিয়া তিনিই তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন।

"অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোঽধিকম্।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে॥"

অর্থাৎ অমৃত অতি মধুর ; কিন্তু সংস্কৃত তাহা অপেক্ষাও মধুর ; ইহা দেবতার ভোগ্য, তাই 'দেবভাষা' নামে কথিত।

"ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্য্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্ব্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম॥"

জানি না, সংস্কৃতে কি মহা মাধুর্য্য রহিয়াছে; যাহার জন্য— আমরা বিদেশী হইয়াও সর্ব্বদাই সমুন্মত্ত।

"যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্॥"

যতদিন ভারতবর্ষ থাকিবে, যতদিন বিন্ধ্যাচল ও হিমাচল রহিবে, যতদিন গঙ্গা ও গোদাবরী থাকিবে, ততদিন সংস্কৃত ভাষা থাকিবে।

তৎকালে সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ও উইলসন্ সাহেবকে একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটী এই ;—

"গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্য্যাং,
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সং-স্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।

হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো 'মেকলে' ব্যাধরাজঃ,
সাশ্রু ব্রূতে স ভো ভো উইলসন মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ॥"

অর্থাৎ কলিকাতা-নগরীস্থিত গোলদীঘির বহু বিটপি-বিরাজিত তটদেশে সংস্কৃত পাঠগৃহরূপ যে কৃশকায় কুরঙ্গ এতদিন নিঃসঙ্গভাবে বাস করিতেছে, 'মেকলে' নামে এক প্রবল ব্যাধ তাহাকে বধ করিবার জন্য আজ তীক্ষ্ণশর ধারণ করিয়াছে। ঐ কুরঙ্গ এখন ভীত হইয়া সাশ্রু-নয়নে বলিতেছে,—ভো ভো মহাত্মন্ উইলসন! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

ইহার উত্তরে উইলসন সাহেব তর্কবাগীশ মহাশয়কেও একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন। সে কবিতাটী এই ;—

"নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্ বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্ব্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ-
র্দূর্ব্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্ব্বলে॥"

অর্থাৎ নিত্য বহু প্রাণীর শত শত পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট হইতেছে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সদৃশ সূর্য্যকরনিকরে সন্তপ্ত হইতেছে, ছাগাদি জন্তুগণ নিত্য চর্ব্বণ করিতেছে, 'কোদালী' দ্বারা কত চাঁছিয়া ফেলা হইতেছে, তথাপি অতি ক্ষীণতনু দূর্ব্বা কিছুতেই মরিতেছে না ; কেন না দুর্ব্বলের প্রতিই বিধাতার দয়া। ফল কথা—যতই অত্যাচর হউক, সংস্কৃত কখন লোপ পাইবে না ; বিধাতাই উহাকে রক্ষা করিবেন।

ফলে, লর্ড মেকলের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। বরং সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতি তাহার পর হইতে বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। *

---

* স্নেহশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ, উদ্ভটসাগর মহাশয় আমাকে এই প্রবন্ধের শ্লোক কয়টী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এই বিবরণটীও আমি তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম।

যরী, রলা, ইরং, নয়

এক পর্ব্বতময় গভীর অরণ্য। সেই অরণ্যমধ্যে একস্থানে এক প্রশান্ত পুণ্য তপোবন। তত্রত্য বিভিন্ন গিরিগুহায় কতিপয় তাপস কঠোর সাধনায় নিমগ্ন।

হঠাৎ অদূরে মনুষ্য-কণ্ঠোচ্চারিত কয়েকটী করুণ কথা শ্রুত হইল। এক সাধক শুনিলেন,—কে যেন বলিতেছে,—ভগবন্! আমি স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ভরণপোষণে অক্ষম হইয়া আজ উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত। আমায় ক্ষমা কর, আত্মহত্যাজনিত পাপ যেন আমার পরলোকপথ পঙ্কিল করে না।

সাধক এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

কে তুমি আত্মহত্যায় উদ্যত? আমার নিকট আইস, তোমার মঙ্গল হইবে।

এ কথা শুনিবামাত্র মরণোদ্যত পুরুষ আশান্বিত হইল এবং ঐ কথায় উৎপত্তি-স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমে সেই সাধকের সন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল।

সাধক দেখিলেন,—এক জীর্ণশীর্ণ ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! সাধক তাঁহাকে অধিক কিছুই বলিলেন না। একখানি নাতিদীর্ঘ নাতিবিস্তৃত প্রস্তরখণ্ডে অন্য একখানি প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা কয়েকটী সাঙ্কেতিক অক্ষর লিখিয়া দিলেন, আর

ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—আপনি এই প্রস্তরখণ্ডখানি লইয়া গিয়া নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণকে দিন। আপনার আর্থিক কষ্ট দূর হইবে।

ব্রাহ্মণ তাপসের কথায় বিশ্বাসী হইয়া আশাপূর্ণ-মনে নাটোরে আসিলেন এবং মহারাজ রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্তর-খণ্ডখানি প্রদান করিলেন। মহারাজ পড়িয়া দেখিলেন—প্রস্তরে লেখা আছে—'বন্নী, রলা, ইরং, নয়।' রাজা কিছুই বুঝিলেন না। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঘটনা শুনিলেন। মন চঞ্চল হইল। কিন্তু এই অক্ষরগুলির অর্থ কি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতসভা আহ্বান করিলেন। বড় বড় পণ্ডিত সমস্যা-পূরণে বসিয়া গেলেন। একে একে অনেক প্রকার পূরণ হইল। কিন্তু রাজার চিত্ত কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। অবশেষে এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি সভাপণ্ডিত ঐ প্রস্তর-লিখিত অক্ষরগুলির পর পর দুই দুইটী অক্ষরের আদি ও অন্ত্য অক্ষর প্রতি চরণের আদিতে ও অন্তে যোজনা করিয়া এক অপূর্ব্ব ভাষায় শ্লোক রচনা করিলেন।

শ্লোকটী এই,—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং,
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

অর্থাৎ যদুপতির মথুরাপুরী এখন কোথায়? রঘুপতির উত্তরকোশলা বা অযোধ্যায়ই বা এখন কৈ? ইহা বিবেচনা করিয়া মন স্থির কর, এজগৎটা যে কিছুই নয়—অসৎ, তাহা অবধারণ কর।

এই শ্লোক পূরণ হইবা মাত্র মহারাজের অন্তরে কি যেন পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। হঠাৎ বিষয়বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ বহুধন পাইয়া বিদায় হইলেন। মহারাজের বৈরাগ্যফলে নাটোরের বিশাল রাজ্যৈশ্বর্য্য একে একে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। সেই দিন হইতেই তিনি 'সাধক রামকৃষ্ণ' নামে প্রখ্যাত হইলেন। ক্রমে প্রকাশ পাইল—রামকৃষ্ণ পূর্ব্বজন্মে কতিপয় তাপস সহ এক স্থানে তপস্যা করিতেন। অন্তরে ভোগবাসনা হওয়ায় তিনি তাপস দেহ ছাড়িয়া রাজদেহ ধারণ করেন। পূর্ব্ব সঙ্গী তাপসদিগেরই কেহ তাঁহাকে ভোগপ্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ঐরূপ বৈরাগ্যো-দ্দীপক সাঙ্কেতিক শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। *

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রণীত 'রাণী ভবাণী' উপন্যাস যখন 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মহারাজ রামকৃষ্ণের বৈরাগ্যসম্বন্ধীয় এই প্রাচীন-পরম্পরা-শ্রুত প্রবাদবিবরণীটী আমি তাহাতে লিখিয়া দেই। সেখানে লাহিড়ী মহাশয় 'নোটে' লিখিয়াছিলেন—"পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় মহারাজ রামকৃষ্ণের সংসার-বৈরাগ্য-সংক্রান্ত এই

(দ্বিতীয় শাখা)

ভাবুকতা।

এক আসরে নাচওয়ালীর নাচ হইতেছে। ইতর ভদ্র নানা-শ্রেণীর দর্শক একমনে নাচ দেখিতেছেন। সুন্দরী নাচওয়ালী নানারকম হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া নাচ দেখাইতেছে। এক সময় নাচওয়ালী মাথার উপর একটা কলসী রাখিয়া নাচিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধে সেই কলসীর দিকে নিবদ্ধ। কলসী ও মস্তক ঠিকই আছে; কিন্তু তাহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতি সুন্দরভাবে নাচিতেছে। সে নাচে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ; সকলেরই চিত্ত হর্ষোৎফুল্ল। কিন্তু এক ভাবুকের নেত্র অশ্রুপ্লুত। ইহা দেখিয়া অন্যান্য দর্শকবৃন্দ নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ভাবুকের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি তন্ময়ভাবে সজল-নেত্রে সেই নাচ-দৃশ্যই দেখিতেছেন।

শেষোক্ত প্রবাদবিবরণী প্রদান করিয়াছেন।" কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় [বোধ হয় অন্য কোন কিছুর উপাদান-উপচয়ের উদ্দেশে] দ্বিতীয়-সংস্করণ 'রাণী ভবানী' হইতে ঐ প্রবাদবিবরণীটী বাদ দিয়া দেন। আমি এ গ্রন্থে ভিন্ন রচনা-ভঙ্গীতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যথাকালে আসর ভাঙ্গিল। নাচ দেখিয়া যে যার গৃহের দিকে চলিল। তখন সেই ভাবুককে আসিয়া কতিপয় লোক উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয়! সবাই তো নাচ দেখিয়া হৃষ্ট হইল। আর আপনার চক্ষে জল আসিল কেন? ভাবুক বলিলেন, ভাই সকল! নাচওয়ালী যখন ঊর্দ্ধে সেই কলসীটার দিকেই স্থির-দৃষ্টি রাখিয়া অতি সৌষ্ঠবের সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাচাইতেছিল, তখন আমি ভাবিতেছিলাম, হায় রে, সংসারে যদি সবাই এমনই ভাবে উপর ঠিক্ রাখিয়া চলিতে পারে, তা হ'লে তার সকল কাজই শোভন ও সফল হইয়া থাকে। এই ভাবাবেশেই আমার অশ্রুপাত হইতেছিল।

মাথায়—'না'।

নিতাই তাঁতির বয়স হইয়াছে। অনেক দিন আগে মাথায় কি একটা ব্যারাম হইয়াছিল, এখন সে ব্যারাম নাই বটে; কিন্তু তাঁতি মহাশয়ের মাথাটা এখনও যখন তখন কিঞ্চিৎ কাঁপে। একদিন নিতাই তাঁতি বাজারে মাছ কিনিতে গিয়াছেন। মেছুনীর সহিত মাছের দর দস্তুর চলিতেছে। নিতাই বলিলেন,—এই মাছটা কত রে! মেছুনী বলিল,—ছয় আনা। নিতাই বলিলেন, ছয় আনা কিরে! এর ন্যায্য দাম হ'চ্চে তিন আনা, কেমন—

তিন আনায় দিবি রে! এই বলিয়া—মেছুনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁর মাথাটী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একটু জোরে কাঁপিতে লাগিল। মেছুনী মাছের দর শুনিয়া মনে মনে ভারী চটিয়াছে; কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া ধীরভাবে উত্তর করিল,—আমি ত' মাছ তিন আনায় দিতে পারি; কিন্তু তোর যে মাথায় 'না' বলে।

মেছুনীর উত্তর শুনিয়া তাঁতিমহাশয় এক পা'য় দু'পায় প্রস্থান।

উদার ধনী।

প্রায় পনর কি ষোল বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এক ধনী ছিলেন। ধনীর ধন ছিল অগাধ; কিন্তু বাজে ব্যয়ে তিনি একান্তই নারাজ ছিলেন। এই ধনীর মতে খাওয়া-দাওয়া, মজা করা—আর ধনের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হ'চ্ছে, বারবধূ-পোষণ করা। ইহা ভিন্ন অন্য যে কিছু কাজ, সকলই বাজে কাজ। যদি কেহ বলিত, মহাশয়! আপনার তো অগাধ অর্থ আছে। আপনার আত্মীয় অমুক দুঃস্থ কন্যাদায়ে বিপন্ন; আপনি তাহাকে কিছু সাহায্য করুন না? ধনী উত্তর করিতেন, উহা বাজে ব্যয়,

আমি ওরূপ ব্যয় পছন্দ করি না। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা যদি বলিতেন, বাবা, আজ বড়ই পুণ্য দিন; আমি গঙ্গাস্নান করিয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদিগকে কিছু দান করিব। ধনী পুত্র অমনি বলিতেন, —মা, অমন করিয়া বাজে কাজে অর্থব্যয় করিলে, শেষে আমি কি খাইয়া বাঁচিব?

মোট কথা এই যে, যাহাতে অর্থদান করিতে হইবে, এমন কোন সৎকাজই তিনি পছন্দ করিতেন না, কিছুতে তাহা করিতেনও না। তবে যদি কোন গতিকে জানিতে পারিতেন যে, অমুক বেশ্যার সংসার চলে না, বা অমুক ব্যক্তি অর্থাভাবে বেশ্যা পোষণ করিতে পারিয়া উঠিল না, অথবা বেশ্যাপোষণ করিতে গিয়া অমুক বাবুর বাস্তুভিটা নিলামে চড়িয়াছে; তাহা হইলে যত টাকাই লাগুক, তিনি সে পক্ষে মুক্তহস্ত হইতেন। এ সব ব্যাপারে অর্থ যতই লাগুক, তাহাতে অকাতরে অর্থদান তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। এই ধনী বাবুর কৌলিক গুরু পুরোহিত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা ইঁহার স্বভাব-চরিত্র বুঝিতে পারিয়া ধনীর বাড়ীর ছন্দাংশেও আসিতেন না।

একদা এক দূর-দেশাগত ব্রাহ্মণ না জানিয়া এই ধনীর নিকট 'মাতৃশ্রাদ্ধ' বলিয়া কিছু প্রার্থনা করিলেন। ধনী এ প্রার্থনায় একেবারে চটিয়া গিয়া ব্রাহ্মণকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ভগ্নমনে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন।

কয়েক দিন পরে ঐ ধনী ব্যক্তির পুরোহিতের সহিত ব্রাহ্মণের

আলাপ পরিচয় হইল। ব্রাহ্মণ কথায় কথায় সেই ধনী ব্যক্তি-কৃত লাঞ্ছনার কথা উক্ত পুরোহিতের নিকট ব্যক্ত করিলেন। পুরোহিত সব কথা শুনিয়া বলিলেন—ও, আপনি ঐ পাষণ্ড ব্যাটার বাড়ী গিয়াছিলেন। ঐ কুলাঙ্গার আমারই যজমান; কিন্তু কোন কাজে এক কপর্দ্দকও উহার বাড়ীতে এ যাবৎ আমি পাই নাই। ও ব্যাটা বেজায় বেশ্যা-খোর! ওর কাছে বেশ্যার খরচ চাহিলে অনায়াসে পাওয়া যায়। ভাল কথা, আপনি এক কর্ম্ম করুন,—এরূপ বেশ-ভূষায় চলিবে না। ইহা অপেক্ষা একটু চটকদার বেশ-বিন্যাস করিয়া আবার কয়েকদিন পরে ঐ ধনীর বাড়ী যাউন এবং গিয়া আপনি যে বেশ্যার খরচ যোগাইতে পারিতেছেন না, এই কথাটাই একটু সাজাইয়া গুছাইয়া বলুন।

ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। যথাকালে ধনীর বাড়ী গিয়া বলিলেন,—মহাশয়! আমি অতি কষ্টে এতদিন একটী বেশ্যা পোষণ করিতেছিলাম, এখন আর পারি না। পাঁচটী শত টাকার অভাবে ঐ বেশ্যাটী আমার বিগড়াইয়া যায়; তাই মহাশয়ের নিকট আমার এই দুঃখ কাহিনী জানাইতে আসিলাম। ধনী ব্যক্তি আগন্তুকের মুখে এই অভাবের কথা শুনিবা মাত্র একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—আপনি আর বিলম্ব করিবেন না; এখনই পাঁচ শত টাকা লইয়া যাউন। আহা, সেই বেচারী বারবধূ টাকার অভাবে না জানি কত কষ্টই পাইতেছে! ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ পাঁচশত টাকা পাইয়া বিদায় হইলেন।

এই ঘটনার একটু পরেই বাড়ীর পাশের ‘নীলু’ খুড়ো উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বেশ বেশ, বাবাজীর এরূপ মতিগতি হইয়াছে, ইহা বড়ই সুখের কথা। তুমি পাঁচশত টাকা একটা শ্রাদ্ধে দান করিয়াছ, শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।

ধনী ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—সে কি খুড়ো, আমি কবে কোন্ শ্রাদ্ধের জন্য দান করিয়াছি?

খুড়ো বলিলেন,—এই যে এই মাত্র এক ব্রাহ্মণ ‘পাঁচশ’ টাকা লইয়া গেল। ধনী বলিলেন, সে তো শ্রাদ্ধের জন্য নয়; সে তো তার বেশ্যাখরচ।

নীলু খুড়ো। তা’হলে ব্রাহ্মণ তোমায় ফাঁকি দিয়া শ্রাদ্ধের জন্যই টাকা লইয়া গেল। এই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বেও একদিন এসেছিল।

ধনী একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন,—তা’ আমি তো তাকে বেশ্যা-খরচ ব’লেই দিয়েছি। সে এখন যা-ইচ্ছা তাই করুক গে’।

নীলু খুড়ো উত্তর শুনিয়া অবাক্। মনে মনে ভাবিলেন,—ওঃ, হতভাগার কি অধঃপতনই হ’য়েছে!

দারোগা ম'শায় ভাল লোক।

পূর্ব্ববঙ্গের এক পুলিশথানার নিম্ন দিয়া একটী নাতিবৃহৎ নদী প্রবাহিত। নদীপথে বহু নৌকা যাতায়াত করে। এক সময়ে থানার সন্নিকটে কি একটা বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। বাঁধটী মেরামত করিবার জন্য দারোগা বাবু বিব্রত হইয়া পড়েন। তিনি স্থির করিলেন,—বেগার ধরিয়া কাজ করিয়া লইবেন। একজন কনেষ্টবলের উপর হুকুম হইল,—নদীপথে যে সকল লোক যাতায়াত করিবে, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে হইবে। কনেষ্টবল হুকুমমত নৌকাযাত্রীদিগকে ডাকিয়া থানায় দারোগা বাবুর নিকট পাঠাইতে লাগিল। দারোগা তার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোক লইয়া কাজে লাগাইতে লাগিলেন এবং কার্য্যান্তে লোক বুঝিয়া কিছু কিছু খোরাকীর ব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিলেন।

এইরূপে সে দিন নদীপথে যত নৌকা যাইতে লাগিল, দারোগার হুকুমে কনেষ্টবলের ডাকে সকল নৌকাই থানার ঘাটে আসিয়া ভিড়াইল।

ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর। এমন সময় একখানি ক্ষুদ্র নৌকা নদীপথে দেখা দিল। নৌকার মাঝী ও আরোহী মাত্র দুইজন।

আরোহী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ শিষ্যালয়ে যাইতেছেন। কনেষ্টবল দূর হইতেই নৌকা দেখিয়া ডাকিতে লাগিল। মাঝা নৌকা ভিড়াইল। কনেষ্টবল বলিল,—তোমাদিগকে দারোগা বাবুর নিকট যাইতে হইবে। এই কথা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ ভয়ে কম্পমান। বলিলেন,—বাপু, আমাদের ছাড়িয়া দাও, আমরা কোন অপরাধ করি নাই। কনেষ্টবল সে কথা শুনিল না; সে উপহাসের ভাবে বলিল,—ঠাকুর, চলে এস না, দারোগা বাবুর কাছে গেলেই খাওয়া-দাওয়া-বিদায়টা ভাল রকমই হবে এখন। দারোগা লোক ভাল, এই বলিয়া কনেষ্টবল একটু মুচকী হাসিল। কিন্তু কনেষ্টবলের এ উপহাস সরল ব্রাহ্মণ আদৌ বুঝিলেন না; বরং একটু আশান্বিত হইয়াই কনেষ্টবলের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কনেষ্টবল অগ্রে অগ্রে, পশ্চাতে যষ্টিহস্তে কুব্জদেহ ব্রাহ্মণ, আর সর্ব্ব পশ্চাতে নৌকার মাঝী। এই ভাবে কনেষ্টবল গিয়া থানায় হাজির হইল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যষ্টিতে ভর করিয়া দারোগা বাবুর নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। দারোগা জাতিতে মুসলমান; কিন্তু আকৃতি দেখিলে তাঁহাকে মুসলমানের মত বোধ হইত না। বাহিরে তাঁহার 'পুলীশী' জুলুম থাকিলেও অন্তঃকরণ তাঁহার খুবই ভাল। তিনি দূর হইতে একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিয়াই কনেষ্টবলের উপর চটিয়া গিয়াছেন। কনেষ্টবল উহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া আবার নদীতীরে চলিয়াছে। দারোগা কর্কশস্বরে কনেষ্টবলকে ডাকিয়া

বলিলেন, ওরে হারামজাদা, আমি কি তোরে এইরূপ বুড়ো হাবড়া মানুষ আনিতে বলেছি ?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হুজুর, আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। আমি কিছুতেই আসিতে চাই নাই। কিন্তু এই কনেষ্টবল বলিল, আমাদের দারোগা বাবু বড় ভাল লোক; তিনি ব্রাহ্মণ সজ্জন বড় ভালবাসেন, আপনি এ মধ্যাহ্নে থানায় গেলে, তিনি আপনার প্রসাদ না পাইয়া ছাড়িবেন না। আমি দেখিলাম, বেলাও হইয়াছে, যাই এখান থেকে মধ্যাহ্ন-কৃত্যটা সারিয়া যাই। তাই এত কষ্ট করিয়া আসিলাম।—শুনিয়া দারোগা বিষম ক্রুদ্ধ। ক্রোধে তাঁহার গোঁপ ফুলিল, গা কাঁপিল, তিনি তৎক্ষণাৎ পায়ের জুতা খুলিয়া কনেষ্টবলের দিকে ধাবিত। কনেষ্টবল দৌড়াইল। দারোগা রাগে গরগর করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া চট করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—যাও ঠাকুর, অন্য জায়গায় রান্না-বান্না করিয়া খাও। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া আস্তে আস্তে বিদায় হইলেন।

পরীক্ষা।

রামনাথ একটী সংস্কৃত টোলের ছাত্র। বাড়ীতে খাইয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী টোলে গিয়া নিত্য রামনাথ পড়াশুনা করেন। রামনাথের পিতামাতা পুত্রের বুদ্ধিমত্তায় বিশেষ আস্থাবান্। পুত্র যে ক্রমেই একজন পণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে, এই ধারণাই তাঁহারা করিয়া আসিতেছেন। রামনাথ যে একজন বিজ্ঞ লোক, এ ভাবটা তাহার নিজের কথাবার্ত্তায়ও যখন তখন প্রকাশ পাইত। কিন্তু রামনাথকে যিনি পড়াইতেন, সেই অধ্যাপক বুঝিয়াছিলেন—রামনাথ একটী অপদার্থ।

ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের আমলে যখন সংস্কৃত-পরীক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়, তখন রামনাথ যে টোলে পড়িত, সেই টোলের ছাত্রেরাও এক বৎসর পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। নিকটেই একটা পরীক্ষাকেন্দ্র হইয়াছিল। রামনাথ প্রভৃতি সেইখানে পরীক্ষা দিতে গেলেন। পরীক্ষার কাল চারি ঘণ্টা। প্রশ্ন পত্র দেখিয়া লিখিত উত্তর প্রদান করিতে হইবে। যথাকালে প্রশ্নপত্র বিতরিত হইল। সকলে মনোযোগের সহিত প্রশ্ন পড়িয়া তাহার উত্তর লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু রামনাথ এমনই বুদ্ধিমান্ যে, এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল। তিনি বাড়ী চলিয়া আসিলেন; পিতামাতা প্রভৃতি আত্মজনের নিকট নিজের খুব বাহাদুরী করিতে লাগিলেন। পিতা মাতার আহ্লাদ

আর ধরে না। তাঁহারা জনে-জনের নিকট পুত্রের সুখ্যাতি করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার রামনাথ এক ঘণ্টায় সব প্রশ্নের উত্তর দিয়া আসিয়াছে। যথাকালে পরীক্ষার ফল বাহির হইল।—টোলের আর আর ছাত্র পাশ; কিন্তু রামনাথ ফেল। রামনাথ বলিলেন, নিশ্চয়ই পরীক্ষকদিগের বুঝিবার দোষ। আমি কখনও ফেল হই নাই। রামনাথের পিতা পুত্রের ফেল হইবার কারণ জানিতে গিয়া জানিলেন,—তাঁহার পুত্র একটী প্রশ্নেরও উত্তর করে নাই, মাত্র প্রশ্নপত্রগুলি অবিকল নকল করিয়া দিয়া আসিয়াছে। শুনিয়া সকলের উচ্চ হাস্য।

কথকতার কথা।

একমাস ধরিয়া কুণ্ডুবাড়ী কথকতা চলিতেছে। প্রত্যহ নানাজাতীয় বহু শ্রোতার সমাগত হইতেছে। আসরে লোক ধরে না। বিজ্ঞ কথকের মুখে ধর্ম্মপ্রস্তাব শুনিবার জন্য লোকের তখন এতই আগ্রহ ছিল। একদিন কথক মহাশয় তাঁহার আরব্ধ প্রস্তাবের প্রসঙ্গে মহাবীর পবননন্দনের অবতারণা করাইয়া জনৈক ঋষির মুখে বলাইতেছেন,—'এই যে বানরেন্দ্র উপস্থিত, এস এস।' কথক মহাশয় এই কথা যখন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, ঠিক এই সময় পাড়ার রামনিধি চাটুয্যে লোক সরাইয়া সভায় আসিয়া উপস্থিত। শ্রোতৃগণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া

সবাই উচ্চহাস্য করিল। চাটুয্যে মহাশয় একটুও অপ্রতিভ হইলেন না। তিনি বেশ রসিক লোক; তাই তৎক্ষণাৎ শ্রোতৃগণকে বলিলেন, আঃ, তোমরা একটা বানরের কথায় এত ক'রে হাসছ? আবার হাসির স্রোত বহিল। কথক মহাশয় চাটুয্যে মহাশয়ের এই শ্লেষপূর্ণ জবাবে অন্তরে খুব আনন্দিত হইলেন।

নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত

এক ভাই নৈয়ায়িক, আর এক ভাই স্মার্ত্ত। স্মার্ত্ত বাড়ীতে নাই। নৈয়ায়িক বাড়ীতে আছেন। এক যজমানের একটী শিশুপুত্রের মৃত্যু হওয়ায় যজমান-বাড়ী হইতে জানিতে আসিল,—মৃত পুত্রটীকে দাহ করিবে, কি মাটী দিবে? জাতদন্ত ও অজাতদন্ত শিশুর পক্ষে যে ভিন্ন ব্যবস্থা আছে, নৈয়ায়িক তাহা জানিতেন না। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়া দিলেন—শিশুটীকে গিয়া মাটী দাও। নৈয়ায়িকের ব্যবস্থা মত মাটী দেওয়া হইল। কিছুকাল পরে স্মার্ত্ত পণ্ডিত বাড়ীতে আসিলেন। তিনি আসিয়া সব কথা শুনিলেন; শুনিয়া বলিলেন, দাদা ক'রেছেন কি, ব্যবস্থাটা যে একেবারেই অশাস্ত্রীয় হইয়াছে। জাতদন্ত শিশুর পক্ষে তো অগ্নিদাহই ব্যবস্থা!

নৈয়ায়িক উত্তর করিলেন, তা' ভাই ক্ষতি করিয়াছি কি? যদি দাহ করাই ব্যবস্থা হয়, তবে এখনও মাটী হইতে তুলিয়া

দাহ করাইতে পার। বলি, আমি যদি দাহ করাইবার ব্যবস্থা দিতাম, আর তোমার স্মৃতির মতে যদি মাটী দিতে হইত, তখন তো আর উপায় থাকিত না! স্মার্ত্ত বলিলেন—বাঃ, নৈয়ায়িকী বুদ্ধি বটে!

———

স্বপ্ন-দর্শন।

গ্রীষ্মকাল। একটু একটু বাতাস বহিতেছে। দিবসের অপরাহ্ণে দাদা-নাতী এক শয্যায় শুইয়া আছেন। উভয়েই নিদ্রিত। কিছুক্ষণ বাদে নাতী চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল,—দাদাম'শায়! করেন কি, করেন কি? আমার পিছনে কাপড়ের নীচে কি খুঁজ্‌ছেন? দাদা চমকাইয়া উঠিয়া বল্লেন,—আঁা, আমি কি তোমার কাপড়ের নীচে খুঁজ্‌চ্চি? ওঃ, আমি একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।

নাতী। কি স্বপ্ন দেখ্‌তেছিলেন, দাদাম'শায়?

দাদা। স্বপ্নটা দেখ্‌ছিলাম এই যে, আমি যেন আকাশে উঠেছি। আকাশের বহুদূরে ঊর্দ্ধে উঠে, প'ড়ে যাওয়ার মত হ'য়েছি। নীচে আশ্রয় কিছুই নাই। এইবার নিশ্চয় পতন মনে ক'রে আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘগুলির কোন একটা ফাঁকে আঙ্গুল ঢুকাইয়া কোনরূপে ঝুলিয়া থাকিবার মত চেষ্টা ক'চ্ছিলুম। তা' ওটা যে তোমার পিছন দিক্, সেটা আমি বুঝ্‌বো কি ক'রে?

দাদামশায়ের স্বপ্নকথা শুনে হাসিতে হাসিতে নাতীর দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

আমি অনাথ।

এক দুর্ব্বৃত্ত পুত্র ঝগড়া করিয়া ক্রোধের বশে পিতা মাতা উভয়কেই খুন করিল। পুলিশ আসিল। গুণধর পুত্র হাতকড়ি পরিয়া হাজতে গেল। বিচারের দিন স্থির হইল। জজ জুরী-দিগকে লইয়া বিচারে বসিলেন। জুরীরা আসামীকে অপরাধী বলিলেন। জজও জুরীগণের সঙ্গে একমত হইলেন। এইবার রায় বাহির হইল। জজ আসামীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া মরিবার হুকুম দিলেন। আসামী হুকুম শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, এবং হাত যোড় করিয়া বলিল,—হুজুর! আমি পিতামাতা-হীন অনাথ, আমায় দয়া করুন। আসামীর কথায় আদালতে উচ্চ হাসি উঠিল।

মামলাবাজী।

এক সময় বাঙ্গলার একটী জেলা ফৌজদারী মোকদ্দমায় অন্যান্য জেলাকে ছাপাইয়া গিয়াছিল। এই যে এখনকার 'হিহি' সভ্যতা ও শিক্ষায় দেশ ভরপূর হইতেছে, এখনও বোধ হয়,

সরকারী হিসাবপত্রে সেই জেলাটীই ফৌজদারী মোকদ্দমায় অন্য সকল জেলার অগ্রণী। বাইশ কি তেইশ বৎসর পূর্ব্বেকার একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। উক্ত ফৌজদারি-প্লাবিত জেলার কোন গ্রামে এক গৃহস্থ সংসারে দুই ভাই বাস করিত। দুই ভাইরই উপজীবিকা কৃষি। কৃষি-কর্ম্ম করিয়াই তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতেছিল। এই কর্ম্মে তাহারা সম্বৎসর খাইয়া পরিয়া প্রতিবৎসরই কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারিত। কয়েক বৎসর এই ভাবে কাটিল। ক্রমে পারিপার্শ্বিক প্রভাব তাহাদের উপর পড়িল। তাহারা মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিল,—মোকদ্দমা-মামলা না করিলে দেশে নাম জাহির হয় না। তাহারা দুই ভাই মোকদ্দমা বাধাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মোকদ্দমার প্রকৃত হেতু কিছুই মিলিল না। অবশেষে মিথ্যা করিয়া এক ভাই অন্য ভাইয়ের নামে এক ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিল। সাক্ষী—পয়সায় পুষ্ট প্রতিবেশী-দল। ঘোর ঘটায় মোকদ্দমা চলিল। দুই ভাইয়ের সে স্ফূর্ত্তি দেখে কে? মোটামোটা ফীর জোরে উকীল মোক্তার আমদানী হইতে লাগিল। দশ বারো দিন ধরিয়া শুনানী চলিল। হাকিম বলিয়া দিলেন,—অমুক তারিখ রায় বাহির করিব। নির্দ্দিষ্ট দিনে আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। মোকদ্দমার রায় শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। হাকিম বিচারাসনে বসিয়া দীর্ঘ রায় পাঠ করিলেন। ফলে এক ভাইয়ের ত্রিশ টাকা মাত্র জরিমানা

হইল। এই রায় শুনিবামাত্র মামলাকারী উভয় ভ্রাতাই বিচারগৃহের মধ্যে একে অন্যের দিকে তাকাইয়া মাথা নাড়িয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া খুব এক চোট হাসিল্। তাহাদের হাসি আর থামে না। হাকিম-সমেত আদালত শুদ্ধ লোক অবাক্। ব্যাপার কি, কেহই কিছু বুঝে না। শেষে ভাবাবেগে উভয় ভ্রাতাই বলিয়া উঠিল—'হাঃ হাঃ, সুম্মুন্দীরা বিচার করেন, জেরা করেন, জবানবন্দী ল'ন, সওয়াল করেন—বলি মোরা যে একট্যা ভুঁয়া মামলায় নাম জাহির করলাম, তা কোন সুম্মুন্দী বুঝ্লেন না।' এই বলিয়া আরও উচ্চ হাসি। ঘটনা শুনিয়া এক বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন,—দেশে এমন গাধা না থাক্লে কি দেশ এমন উৎসন্নে যায়।

দুইটা ও একটা।

এক জমীদারবাবু নাপিতদ্বারা প্রত্যহ ক্ষৌরকর্ম্ম করাইতেন। একদিন নাপিত জমীদারবাড়ী কামাইতে গিয়াছে। জমীদার চৌকীর উপর বসিয়া আছেন। এই সময় তাঁহার জমীদারী হইতে একটা বড় রকমের ভেট আসিল। ভেটের অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে একটা জিনিষ ছিল বড়ই লোভনীয়। সে জিনিষটা হচ্ছে বড় বড় কৈমাছ। সেরূপ লম্বা চওড়া বড় বড় কৈম্মাছ প্রায় দেখা যায় না। কৈমাছ দেখিয়া জমীদার বড়ই খুসী

হইলেন। নাপিত হাতের ক্ষুর হাতে রাখিয়া সেই মাছগুলির দিকে তাকাইয়া রহিল। শেষে নাপিত একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—এর একটা মাছ খাইয়া মরিলেও সুখ। এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া নাপিত জমীদারকে কামাইবার উপক্রম করিল। নাপিতের অনুচ্চ কথা নিকটস্থ জমীদারের কাণে গেল। কামান শেষ হইলে জমিদার চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন,—আজি-কের এই কৈমাছ থেকে নাপিতকে দুই তিনটা মাছ দিয়ে দাও। নাপিত এই কথা শুনিয়া খুব আহ্লাদিত হইল। সে সোল্লাসে জমীদারের পায়ের ধূলা লইয়া চাকরের অনুসরণ করিল। চাকর কর্ত্তার কথামত নাপিতকে তিনটা মাছ দিল।

নাপিত মাছ লইয়া সানন্দে বাড়ী আসিল। মাছ দেখিয়া নাপতিনীরও খুব আমোদ হইল। নাপ্তিনী তিনটা মাছেরই আঁস ছাড়াইয়া কুটিয়া লইয়া ত্বরাত্বরি রাঁধিতে গেল। রাঁধি-বার সময় নাপ্তিনী ভাবিল,—ইহার একটা আস্ত মাছ ভাজি. আর দুইটা আস্ত মাছ দিয়া ঝোল রাঁধি। আমি একটা ভাজা ও একটা ঝোলের মাছ খাইব, আর মিন্‌ষেকে মাত্র একটা ঝোলের মাছ দিব। মিন্‌ষে নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে গিয়া কত জায়গায় কত ভাল-আভাল খায়, তা'তো আর আমি খাইতে যাই না। আজ হাতে পেয়েছি, ছাড়বো? নাপ্তিনী মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প আঁটিয়া একটা মাছ ভাজিল এবং দুইটা মাছ দিয়া ঝোল রাঁধিল। যথাকালে নাপিত আসিয়া খাইতে

বসিল। তখন নাপ্তিনী প্রস্তাব করিল,—আমি ইহার একটা ভাজা এবং একটা ঝোলের মাছ খাইব, আর তুমি একটা মাত্র ঝোলের মাছ খাইবে। নাপিত এ প্রস্তাব শুনিয়াই চটিয়া গেল, বলিল,—কি এত করিয়া বাবুর বাড়ী থেকে আমি মাছ আনলেম, আর তুই দিতে চাচ্ছিস্ আমায় মোটে তার একটা! তা' কিছুতেই হবে না। আমি দুইটা খাইব, তুই একটা খাইবি। এইরূপ তর্কাতর্কিতে ক্রমে খুব ঝগড়া বাধিয়া গেল। নাপিত ঝগড়ায় হারিল; কিন্তু নাপ্তিনী যে ফাঁকি দিয়ে একাই দুইটা মাছ খাইবে, তা' কিছুতেই অনুমোদন করিল না। এদিকে ঝগড়ায় ঝগড়ায় বেলা প্রায় অবসান। ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তথাচ কেহই কাহারও জেদ ছাড়ে না। তখন নাপিত একটা সংশোধিত প্রস্তাব করিল. নাপতিনীকে বলিল,—আচ্ছা, এই সব মাছ ভাত এই ভাবেই ঢাকা থাক্, আমরা দুইজনেই শুইয়া থাকি। আমাদের মধ্যে যে আগে কথা কহিবে, সে-ই একটা খাইবে, আর যে শেষে কথা কহিবে, সে দুইটা খাইতে পাইবে। নাপ্তিনী এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। নাপিত-নাপ্তিনী উভয়েই তখন শুইয়া পড়িল; দিন গেল, রাত্রি গেল, তার পরের দিনরাত্রি গেল। কেহই কথা কহে না, পাছে একটা মাছ খাইতে হয়।

এদিকে জমীদার দেখিলেন, নাপিত মাছ লইয়া গেল; পর দিন আর কামাইতে আসিল না। তিনি একজন লোক পাঠাইয়া খবর লইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া জমীদার বাবুকে সংবাদ

দিল,—নাপিত-নাপ্তিনী বোধ হয় ঘরে মরিয়া আছে। আমি দুই জনকেই শয্যায় শোওয়া দেখিয়া আসিয়াছি। অনেক ডাক-হাঁক করিলাম, কোনই সাড়া পাইলাম না। জমীদার মনে করিলেন—নাপিত সে দিন বলিয়াছিল, এর একটা মাছ খাইয়া মরিলেও সুখ; নাপিতের বুঝি তাহাই হইল। ব্যাটা মাছ খাইয়াই মরিল। যা হউক, তোমরা দুই তিন জন লোক গিয়া নাপিত-দম্পতির সৎকার করিয়া আইস।

জমীদারের হুকুমে তিন জন লোক নাপিতদম্পতিকে সৎকার করিতে গেল। তাহারা গিয়া সেই শয্যাসমেত দুইজনকেই বাঁধিয়া শ্মশানের দিকে লইয়া চলিল। নাপিত-নাপতিনীর তখনও জ্ঞান আছে; কিন্তু কেহই কথা কহে না। কে আগে কথা কহিয়া একটা মাছ খাইবে, এইজন্যই তাহারা নির্ব্বাক্। ক্রমে চিতা প্রস্তুত হইল, নাপিত নাপতিনী তখনও কথা কহে না। জমীদারের লোক তিনজন যখন চিতা প্রস্তুত করিয়া নাপিত-দম্পতিকে একসঙ্গে চিতায় চাপাইয়া দিবার জন্য ধরিয়া তুলিল, তখন নাপতিনী বেগতিক দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—ওরে নাপিত, তুই খা দুইটা, আমি খাই একটা। এই যেমন বলা, অমনি জমীদারের লোক তিন জন তাহাদিগকে ধপাস্ করিয়া ফেলিয়াই যে যার ছুটিয়া পলাইল। তাহারা ভাবিল,—নাপিত-নাপ্তিনী ভূত হইয়াছে। তাহারা তাহাদের তিনজনকেই লক্ষ্য করিয়া এই কথা কহিয়াছে। এই ভাবিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া

তাহারা জমীদারবাবুকে সকল কথা কহিল। এদিকে নাপিত-নাপ্‌তিনী অতিকষ্টে শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল,—তাহাদের সেই সাধের মাছ ভাত 'শেয়ালে' খাইয়া গিয়াছে।

কিছু লাভ।

রামহরি মিত্র একজন মস্ত বড় ধনী। তাঁহার মত ধনী তাঁহার স্বগ্রামে আর নাই। তিনি ধনে যেমন গ্রাম ছাপাইয়া উঠিয়াছিলেন, কৃপণতায় বোধ হয়, সমস্ত দেশটার উপর টেক্কা দিয়াছিলেন। তাঁহার মত কৃপণ প্রায় দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কালক্রমে মিত্র মহাশয়ের মাতার গঙ্গালাভ হইল। আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই আসিয়া দেখা করিলেন। বড় রকমের একটা শ্রাদ্ধ হইবারই কথা হইল। কিন্তু মিত্র মহাশয়ের মনের ইচ্ছা—কোনরূপে তিলকাঞ্চন করিয়া শুদ্ধ হন। এরূপ ইচ্ছা থাকিলেও মিত্র তা পারিলেন না। শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ খুব লম্বা হইল। মিত্রের মাথা ঘুরিয়া গেল। কি করিবেন? অগত্যা তিনি ফর্দ্দমত ব্যয় করিতেই বাধ্য হইলেন। সকল ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল। একদিন রাত্রে মিত্র মহাশয় শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাইতো, এতগুলি টাকা আমি ব্যয় করিব কি ক'রে? এ টাকাগুলি থাকিলে যে অনেক সুদ পাইতাম।

কি আর করি ? এখন অসম্মত হইলে আত্মীয় স্বজন সবাই আমার উপর চটিবে, ঘৃণা করিবে। তবে একটা কথা আছে। এই সকল খরচের মধ্য হইতে যত বাঁচাইয়া রাখিতে পারি, তাহাই আমার লাভ। ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়, কাঙ্গালীভোজন, বৃষোৎসর্গের দ্রব্যাদি—এ সমুদায় হ'তে খরচ বাঁচান যাইবে না ; ময়রার সঙ্গে যদি আমি নিজে কথাবার্ত্তা কই, তা'লে কিছু লাভ থাকিতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া মিত্র মহাশয় দৈ, সন্দেশ, ক্ষীর প্রভৃতির ভার নিজের উপরই রাখিলেন। যথাকালে শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। নিমন্ত্রিত সামাজিকগণ আহারে বসিলেন। আহারের সময় দেখা গেল—দৈ জলবৎ, সন্দেশ চিনির ডেলা, আর ক্ষীর একরূপ অগ্রাহ্য। দেখিয়াই সামাজিকগণ হাত তুলিয়া বসিলেন ; ব্যবস্থা বন্দোবস্তের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন মিত্র মহাশয় ময়রার উপর কৃত্রিম কোপ করিতে গিয়া ময়রার গলায় গামছা দিয়া নিমন্ত্রিত সামাজিকগণের সামনেই তাহাকে দুই চা'র ঘা বসাইয়া দিলেন ; আর মুখে বলিতে লাগিলেন,—শালা, বাঞ্চৎ, হারামজাদ, তুই এমন করিয়া আমার সব আয়োজন পণ্ড ক'র্‌লি ! ময়রা নির্ব্বাক্, মুখে কথাটী নাই। মিত্র মহাশয় আবার রাগিয়া বলিলেন,—ওরে ময়রার পো, তোকে কেটে ফেল্‌লেও আমার গায়ের রাগ যায় না।

এইবার ময়রার কথা ফুটিল। সে বড় গলায় বলিল,—এরূপ তো কথা নয় ; একটা বৈ দুইটা দেওয়ার কথা ছিল কি ? সকলে

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি? ময়রা তখন বলিল,—মহাশয়গণ! আমার কি অপরাধ আপনারা বিচার করুন। ইনি—এই কর্ত্তা আমায় ব'লেছিলেন, তুই খুব সস্তাদামে যত খারাপ জিনিষ হয় দিবি; তারপর যখন কথা উঠ্‌বে, তখন আমি সকলের সামনে তোর উপর একটু রাগ করব, তা তুই একটুকাল চুপ ক'রে থাকিস্; তা হ'লেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। আমি সেই কথা মতই চুপ করিয়াছিলাম; কিন্তু এ কি, এরূপ গালাগালি বা মারপিটের তো কথা ছিল না!

সকলে শুনিয়া অবাক্! মিত্র মহাশয় লজ্জায় আস্তে আস্তে সে স্থান হইতে প্রস্থান! কিন্তু তাঁর মনে এই প্রবোধ জন্মিল,—যে যতই যা বলুক, আর ভাবুক, আমার যে কিছু লাভ রহিল, তা'র তো আর ভুল নাই-ই।

উত্তম উত্তর।

প্রায় ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে এক মস্ত বড় বাবু ছিলেন। বাবুর অর্থ ছিল যথেষ্ট; বড় একটা জমীদারী ছিল, সমাজেও নাম কাম কম ছিল না, এ সব থাকিলেও বারাঙ্গনা না থাকিলে যে সে কালে বড় লোকের খাতায় নাম উঠিত না; কাজেই তিনি একটী বারবধূ-পোষণে বাধ্য হইলেন। মাসে মাসে অন্যূন পাঁচ ছয় শত টাকা তাঁহার এতদর্থে ব্যয় হইতে

লাগিল। ক্রমে মাসহারা আরও বাড়িল। প্রণয় যতই পাকিয়া আসিল, মাসহারাও ততই বাড়িতে লাগিল।

একদা বারবধূ বাবুর নিকট প্রস্তাব করিল,—আমার বিড়ালটীর বিবাহ দিতে হইবে। তাহাতে কিছু খরচপত্র করা আবশ্যক। বাবু খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে সম্মতি দিলেন। যথাকালে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বারাঙ্গনার বিড়ালের বিবাহোৎসব করাইলেন। বিবাহ-ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বাবুর আনন্দ আর ধরে না। তিনি যেখানে সেখানে সুযোগমত তাঁহার এই ক্রিয়াকীর্ত্তি ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিন নিজ পত্নীর নিকট কথায় কথায় বলিলেন,—তুমি জান, আমার প্রাণ কত উচ্চ? আমি একটা বিড়ালের বিয়ে দিতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ ক'রেছি। পত্নী একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন,—পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় তুমি আর বেশী করেছ কি, আমার শ্বশুর একটা বানরের বিয়ে দিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ ক'রেছিলেন।

বাবু আর কথাটী কহিলেন না! শুনা যায়,—সেইদিন হইতে তিনি আর বারবধূভবনে যান নাই।

সমাপ্ত।